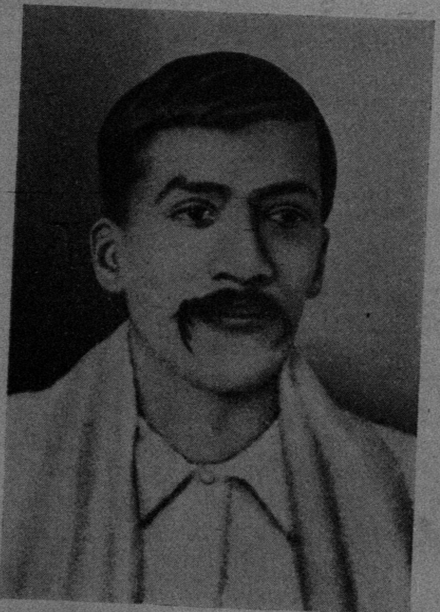
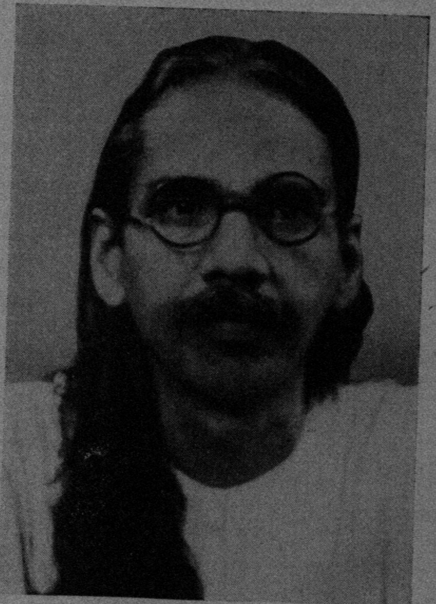


শ্রীঅরবিন্দ



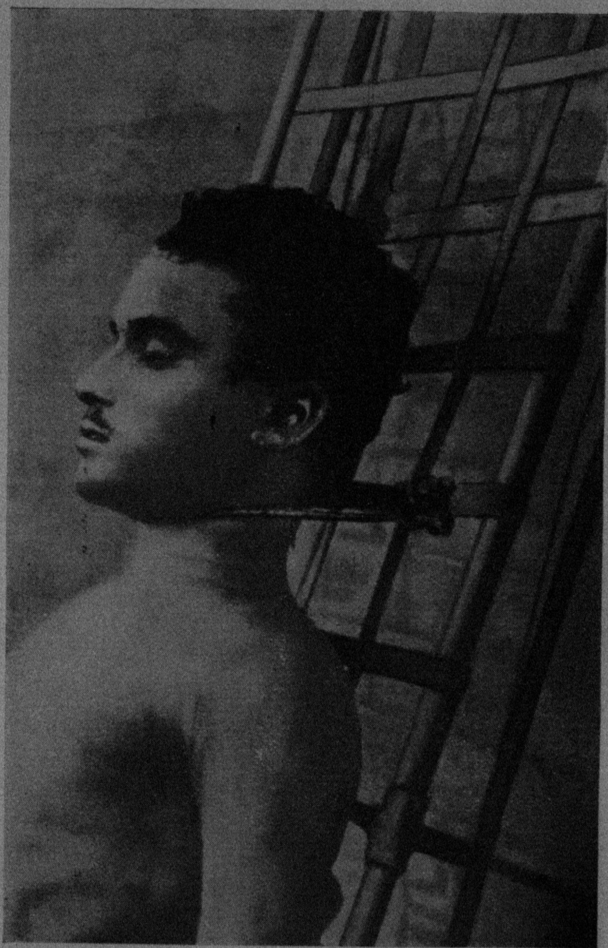
শ্রীবারীন্দ্র
(স্টেট্‌স্‌ম্যানের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ

প্রফুল্ল চাকী

হেমন্ত চাকী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা



প্রফুল্ল চাকীর গুলীবিদ্ধ প্রাণহীন দেহের উপর দিয়া বৈদেশিক শাসনের নির্ম্মমতার বজ্রপেষণ চলিয়াছে!

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা

রাস পূর্ণিমা, ১৩৫৯

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ, কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

যেখানে

নব্য ভারতের

প্রথম ও প্রধান মুক্তি সাধক

প্রফুল্ল চাকী

বাহিরের অসাম্য পরাধীনতা

এবং

অমৈত্রীর বন্ধন হইতে

মুক্তি লাভের জন্য

মৃত্যুর গান গাহিয়া

অমৃতের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন

সেই মাতৃভূমি ভারতবর্ষের যত যত

দেশভক্ত

যাঁহারা আজ জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া

পরলোকগত হইয়াছেন,

যাঁহারা যেখানে বাস করিয়া ধন্য হইতেছেন,

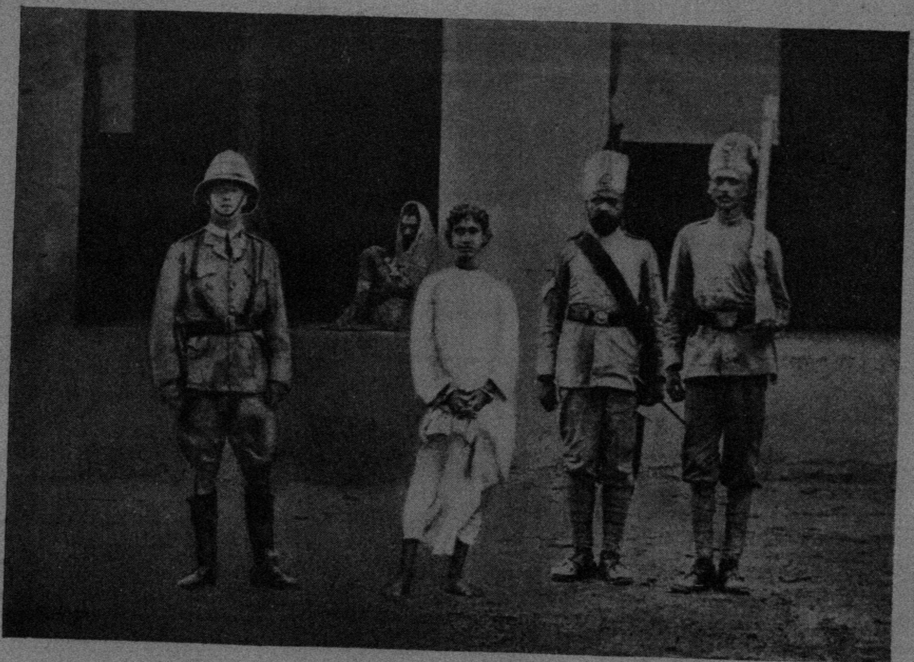
অনাগত কালে যাঁহারা যেখানে আসিয়া

মুক্তি সাধকের সাধনাকে অগ্রসর করিয়া দিবেন

তাঁহাদের সকলের হাতে আমার এই গ্রন্থ

সাদরে

সমর্পণ করিলাম।



মরজীবন ও অমর জীবনের সন্ধিক্ষণে ক্ষুদিরাম বসু

ত্যাগিশ্রেষ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের
মহীয়সী সহধর্মিণী
মাতা বাসন্তী দেবীর

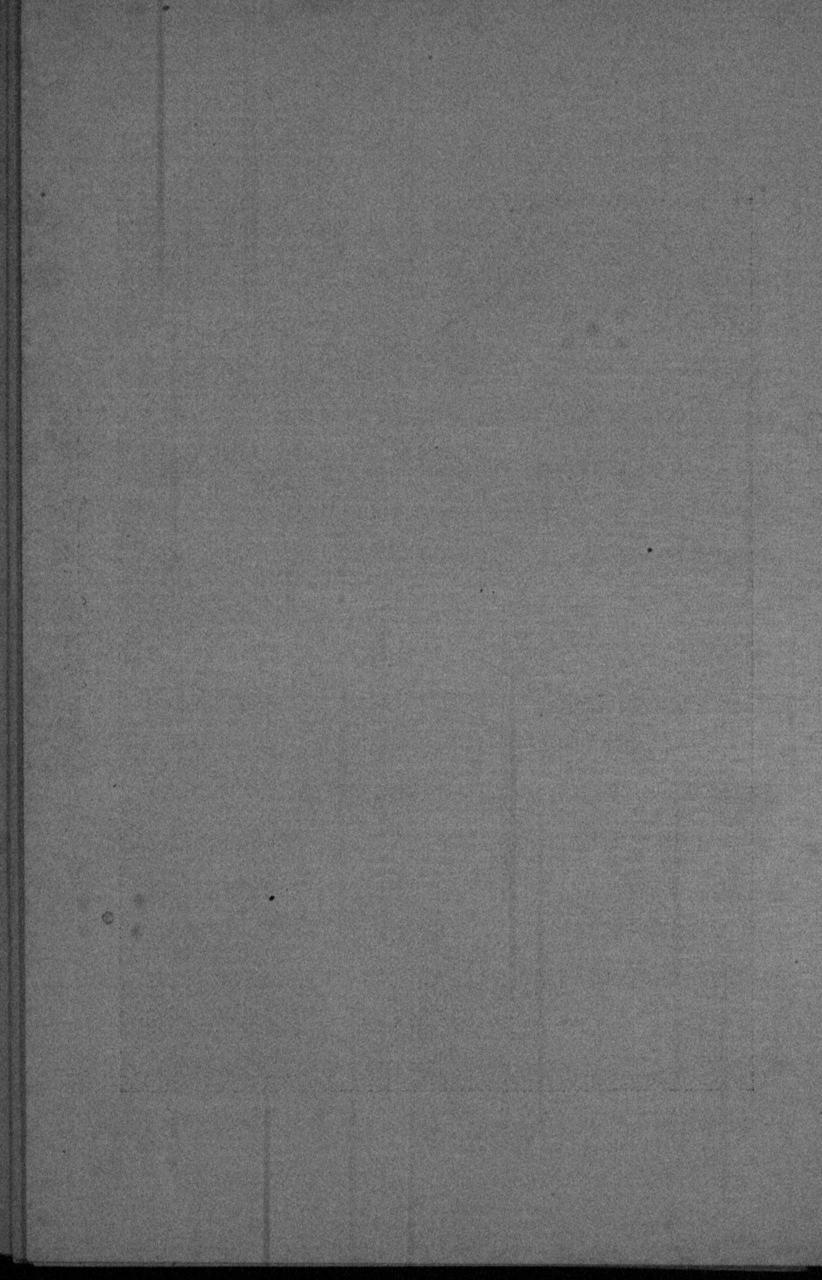
আশীর্বচন

ভারতের নবযুগের ঊষা যে-কয়জন তরুণ বীরের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত হইয়া দেখা দিয়াছিল প্রফুল্ল তাঁহাদের অন্যতম। মৃত্যু ভেদ করিয়া এই বীরেরা স্বাধীনতার অমৃতের সন্ধান করিয়াছিলেন। মরিয়াও তাঁহারা অমর। আজ যেন শ্রদ্ধায় আমরা তাঁহাদের স্মরণ করি। তাঁহারা আমাদের কাছে কিছুই কামনা করেন নাই; আমরা যেন পূর্ণ জীবন লাভ করি এই জন্যই তাঁহারা জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন। প্রফুল্লর সেই ত্যাগী উজ্জ্বল অমূল্য জীবনের স্বপ্ন-দিনগুলির চিত্র লেখক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত দেশবাসীর হাতে সমর্পণ করিতেছেন। জীবনের সায়াহ্নে আমি মাতৃজাতির পক্ষ হইতে লেখকের কল্যাণ কামনা করিতেছি, আর ভাবিতেছি—

"রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?"

পাটনা,
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫১

বাসন্তী দেবী



গ্রন্থকারের নিবেদন

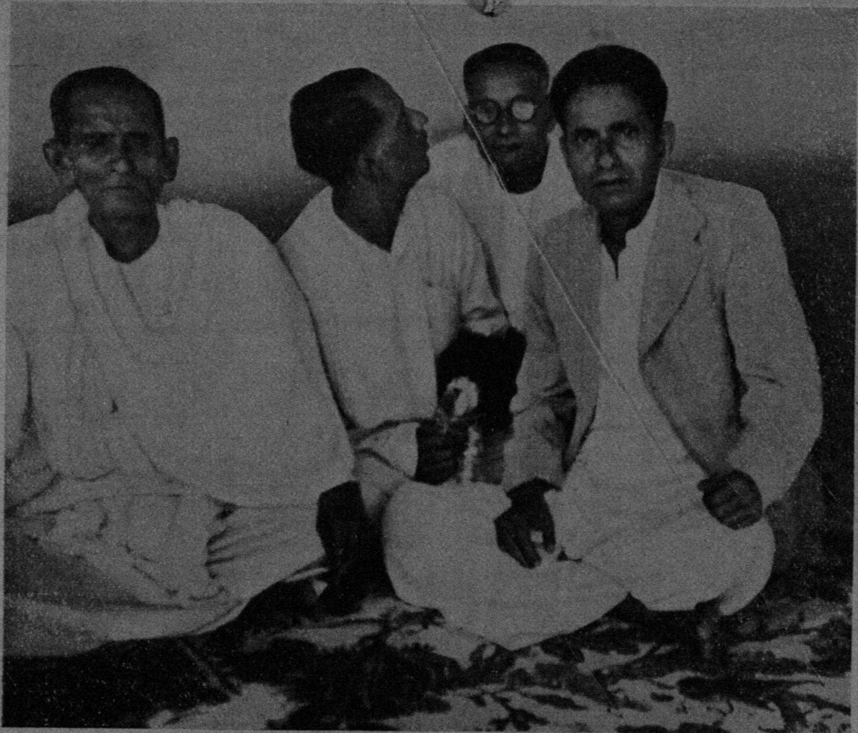
একক প্রফুল্ল চাকী অনেকাংশেই অপূর্ণ—ক্ষুদিরাম মিলিত হইয়া প্রফুল্ল চাকীকে সর্বতোভাবে পূর্ণ ও সার্থক-জীবন করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলায় সেদিন ক্ষুদিরাম না থাকিলে প্রফুল্ল ফুটিয়া উঠিতে পারিতেন না। প্রফুল্ল না থাকিলে ক্ষুদিরামের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইত কি না সন্দেহ। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের জীবনাদর্শ পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইহারা দুইজনেই একই সময়ে বিপ্লব-ধর্মে দীক্ষিত হন, এক সঙ্গে কাজ করেন এবং এক সঙ্গে থাকিতেন এবং একসঙ্গে দেহত্যাগ করেন বলিলেও চলে। জীবিত কালে জীবনের দুঃখ দৈন্য তাঁহারা একসঙ্গে ভোগ করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পরে একই সঙ্গে গৌরব লাভ করিতেছেন। সেই সত্যের অনুসরণ করিয়াই প্রফুল্ল চাকীর চরিত-কথা লিখিত হইয়াছে।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের যে যে কাহিনী শুধু কঙ্কালসার হইয়া আছে বগুড়া, রংপুর, কলিকাতা, মেদিনীপুর, মোকামাঘাট, পাটনা, সমস্তিপুর মজঃফরপুর হইতে নানা তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছি। এতদুদ্দেশ্যে সরকারী দলিল-পত্র, দেশভক্ত আত্মমেধী ক্ষুদিরামের মামলার কার্যবিবরণী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এক মজঃফরপুর শহরেই তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হয়।

প্রখ্যাত আলোকচিত্র-শিল্পীর অনুকৃত-চিত্রে ইহার কলেবর মণ্ডিত হইয়াছে। চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।

হেমন্ত চাকী

বেলী এগ্রিকালচার্যাল ফার্ম
গ্রাম—বেলী,
পোঃ গোসাঁইগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ



ক্ষুদিরামের স্মৃতি-স্তম্ভ-ভিত্তি স্থাপনা উপলক্ষ্যে সমবেত (বাম হইতে)
শ্রীললিত রায়, শ্রীভীম রায়, শ্রীমণীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং লেখক।

ভূমিকা

সাধারণ মানুষ চক্ষের-সম্মুখে যাহা দেখে তাহাই মনে করিয়া রাখে। যাহা একদা ছিল এখন নাই তাহা ভুলিতে তাহার বিলম্ব হয়না—তাহা সে যত বড়ই হউক না কেন। হয়ত একদা সেটুকু নহিলে আজিকার এতখানির আবির্ভাব সম্ভবই হইত না—তথাপি এই সাধারণ নিয়মের বড় একটা ব্যতিক্রম হয় না। যদি কোন মানুষে তাহা না ভুলে তাহাকে একটু অসাধারণ বলিতেই হইবে। ভুলিয়া যাওয়াই যেখানে সাধারণ এই না ভুলাটুকুই সেখানে অসাধারণ। সে হিসাবে এই পুস্তকখানি এবং ইহার লেখক উভয়েরই যৎকিঞ্চিৎ অসাধারণত্বে অধিকার বর্তমান।

একদা দারুণ দুর্যোগ মাথায় করিয়া যে দুটি পথিক স্বেচ্ছায় গৃহের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর পথে শুধু দেশের কথা মনে করিয়াই বাহির হইয়াছিল। যাহাদের ত্যাগের কথা একদিন বাংলার গৃহে গৃহে বালক বালিকার কাছে রূপকথার মতই, তরুণ তরুণীর কাছে প্রেমের কাহিনীর ন্যায় এবং পরপারের যাত্রী যাত্রিণীর কাছে পবিত্র ভগবৎ নামের তুল্য সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে আজ তাহাদের কথা অধিকাংশ নরনারীই ভুলিতে বসিয়াছে। বিশ্বপ্রেম ও অহিংসার মাপকাঠিতে মাপিতে গিয়া কত স্থানে ও কত জনে সেই গৃহহারা বিরাট ত্যাগী বালক দুটিকে আজ দূর পথ হইতে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু সেদিন দুটিতে যেমন ঘোর ঝড় ঝঞ্ঝায় অপ্রতিহত গতি হইয়া শুধু কৃষ্ণ আকাশের বুক চিরিয়া যে বিদ্যুতের আলো বাহির হইয়াছিল সেই ক্ষণপ্রভ আলোক-টুকুতে দুঃসাহসের পথ দেখিয়া চলিয়াছিল—আজিও তাহারা তেমনি নিঃশব্দে শুধু সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ইতিহাসের সুদীর্ঘ চিরঞ্জীব পথ



মজঃফরপুরে ঘটনাস্থলে ক্ষুদিরামের মূর্ত্তি

বাহিয়া চলিয়াছে। নিরাপদ নীতি কথার মোহ, শাস্ত্রাদর্শের বাত্যা, অকৃতজ্ঞতার কঠিন আঘাত কিছুতেই তাহাদিগকে আর পথচ্যুত করিতে পারিবে না।

আজিকার এই বিরাট স্বাধীনতা সৌধের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত ভাগ্যবান মহাপুরুষগণের নিকট হইতে সে দিনকার বুকের পঞ্জর ও হৃদয়ের রক্ত দিয়া রচিত ভিত্তি বহুদূরে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু চূড়ার দৃপ্ত আরোহীরা ও সৌধের নিশ্চিন্ত অধিবাসীরা আজ ভুলিলেও এই স্তব্ধ মৌন বিশাল সৌধ প্রতিক্ষণে অনুভব করিতেছে একদা কে এবং কাহারা তাহাকে বুকের রক্ত দিয়া উপরে উঠাইয়া দিয়া বিশ্বের বিচার সভায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। ভিত্তি চিরদিনই লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত থাকে। ইহাদের ক্ষেত্রেও তাই সে সত্যের ব্যত্যয় হয় নাই।

এই প্রবন্ধ লেখক চক্ষে নিষ্ঠা ও হৃদয়ে প্রীতি ভরিয়া দৃঢ় হস্তে সত্যের বর্তিকা বহিয়া সেই দুর্গম পথচারী পথিক দুটিকে দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ দুজন দুঃসাহসী পথিক নিষ্ঠাবান তীর্থ যাত্রীর প্রতীক মাত্র। তাই লেখকের হস্তধৃত সত্যের আলোক সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে যত পথিক এই পথে চলিয়াছে সবাইকে ভক্তিভরে তাহাদের প্রাপ্য সমাদর দিয়া মনে করাইয়া দিয়াছে—সংসারে কি করিয়া ধীরে ধীরে জাতীয়তার জন্ম হইয়াছিল, গণতন্ত্রের ভাবটুকু জন্মিতে পৃথিবীকে কতদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছে, কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভের মত পরাধীনতার মধ্যে কি করিয়া কতদিনে ভারতের এই মুক্তি সংগ্রামের উদগ্র ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত গভীর তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়া লেখক আপনার উদ্দিষ্ট পথে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছেন।

লেখক চিরপ্রফুল্ল প্রফুল্লর ভ্রাতুষ্পুত্র—পিতৃব্যের ত্যাগপূত জীবনের কথা বলিবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু দেশের লোকেরও

এ জীবনের উপর অন্ন অধিকার নাই। তাই এইরূপ জীবন গৃহের গণ্ডী ছাড়াইয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। লেখক দেশের লোককে তাঁহার পিতৃব্য ও পিতৃব্যের দুর্গম-পথের অবিচ্ছেদ্য সাথীর জীবনের ছবি দুখানি সত্য ও নিষ্ঠার তুলিতে বহু আয়াস সহকারে অঙ্কিত করিয়া উপহার দিয়া সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আমাকে এই কথা কয়টি বলিতে দিয়া তিনি আমাকে অসামান্য মর্যাদা দান করিয়াছেন।

কদমকুঁয়া, পাটনা
১লা বৈশাখ, ১৩৫৮

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

প্রথম অধ্যায়

জাতীয়তার জন্ম

প্রাণধর্মের স্বাভাবিক গতি—আত্মরক্ষা। এই আত্মরক্ষা যেমন করিয়াই হউক করণীয়। যে সবল সে আক্রমণ দ্বারা অপরকে নিহত করিয়া বাঁচিবে; যে দুর্বল সে প্রবঞ্চনা বা পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবে। অনশনে থাকিয়া হউক, অর্দ্ধাশনে থাকিয়া হউক মানুষ প্রাণরক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট—উহাই প্রাণৈষণা (struggle instinct)। এই প্রাণৈষণার পরে মানুষ পুষ্টির সন্ধান করিয়া থাকে। পুষ্টি দিয়া অন্ন দিয়া মানুষ প্রাণ ও দেহকে পুষ্ট করে—ইহাই অন্নৈষণা (nutrition instinct)। ইহার পরেই আসে যৌন এষণা sexual instinct) যাহাকে উপনিষদের ভাষায় পুত্র-এষণা বলে। ইহাই সন্তান সন্ততি দ্বারা আপনাকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিবার প্রয়াস। ইহারই ভিতর দিয়া সন্তানের প্রতি বা সংস্পর্শে আগতদের প্রতি মমতা বোধ বা মাতৃ-এষণার উদ্ভব হয়। উপনিষদের মতে এই অন্নৈষণা প্রাণৈষণার অন্তর্গত এবং পরলোক এষণা কিংবা আধ্যাত্মিক বা আত্মিক উৎকর্ষের আবেগ এই মাতৃ-এষণার সহিত সম্বদ্ধ।

ব্যক্তির জীবনের মতই সমাজ ও মানবতার জীবনও প্রকৃতিরাজ্যের শাসনাধীনে চালিত হয়। এই নিম্ন হইতে উচ্চতর এষণা ব্যক্তির জীবনে যেমন অবস্থা ভেদে আবির্ভূত হয়, সমাজ, রাষ্ট্র, বা মানবতার জীবনেও ইহার আবির্ভাব অবস্থাভেদে হইয়া থাকে। বনে, প্রান্তরে, আকাশে, বাতাসে সর্বত্র সুশৃঙ্খলায় প্রকৃতিরাজ্যের শাসন ব্যবস্থা চলিয়াছে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে অপরিচয়ের জন্যই আমাদের মন এবং দৃষ্টি সংশয়াচ্ছন্ন।

প্রকৃতির সর্বত্র এই পরিপূর্ণতার প্রয়াস। মানুষের জীবনেও তাই। অংশবিশেষ লইয়া তাহার জীবন পূর্ণ হয় না; তাহার সমস্ত জীবনের গ্রহণ-বর্জ্জন, যোগ-বিয়োগ, সাফল্য-অসাফল্যের সমষ্টি লইয়াই তাহার জীবনের পরিপূর্ণতা। অংশবিশেষকে দেখিলে সমগ্রকে দেখা হয় না। তেমনি সমাজ, রাষ্ট্র বা মানবতাকে দেখিতে হয় তাহার সমগ্রতাকে লইয়া। উহাই গতিশীল বা জীবন্ত ছবি। গতিশীলতাই জীবনের লক্ষণ। জীবন যেখানে স্তব্ধ হইয়া যায় সেখানেই মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া উঠে। জীবনের অর্থ গতিশীলতা (Dynamism), ইহার বিপরীত স্থাণুত্ব (static)। ইহারই পটভূমিকায় আমাদের সমস্যাগুলি সমাধানের পথ খুঁজিয়া পায়।

মানুষ প্রথমে নিজের কথাই বহুদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে। পরে সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুবান্ধবের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে। তারপরে সে সমাজ চিনিয়াছে, রাষ্ট্র জানিয়াছে, জাতীয়তা বুঝিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয়তার আদর্শ মানুষের মনে বেশী-

দিন ধরিয়া জাগে নাই। একটি সমষ্টির লোকের মধ্যে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ আছে যাহার ফলে তাহারা একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে; ক্রমে তাহাদের এই গুণগুলির সম্যক প্রকাশের জন্য তাহার একটি পৃথক ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

একটি দল বা সমষ্টির মধ্যে বর্তমান এই যে একপ্রকারের বিশিষ্ট গুণ—ইহার উৎপত্তি নানা কারণে হইতে পারে। দীর্ঘকাল ধরিয়া একস্থানে বাস করিলে এই একজাতীয় বিশিষ্ট মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইতে পারে। এক ধর্মাবলম্বী হইলেও ইহার উদ্ভব হইয়া থাকে। একই প্রবংশ হইতে যদি এক সমষ্টির লোক উদ্ভূত হয়, তাহা হইলেও এই মনোভাব জন্মিতে পারে। এই অনুভূতি সর্বাপেক্ষা প্রবল হয় যদি একদল লোক একই অবস্থায় কোন এক রাজা বা শাসনকর্তার অধীনে সুখ-দুঃখ ও আশা-নিরাশার মধ্যে জীবন যাপন করিতে থাকে। এই অবস্থায় নিজেদের অদৃষ্ট সম্বন্ধে যে একটি একতার সৃষ্টি হয় তাহার বন্ধন খুবই দৃঢ় হয়।

এই যে একত্ববোধ ইহা পাঁচশত বৎসর আগেও কোন সমষ্টি বা জাতির মধ্যে দেখা যায় নাই। গ্রীক ও রোম সাম্রাজ্য খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্বে। কিন্তু তখন এই বিচিত্র একত্ব-বোধ ছিল না। আমাদের দেশেও চন্দ্রগুপ্ত বা অশোকের সময়ে এই জাতীয়তা বোধের অস্তিত্ব ছিল না। ইয়োরোপে মধ্য যুগ পর্যন্ত ধর্মযাজকদের প্রভাবই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল।

কিন্তু তাঁহারা ছিলেন অনেকটা বিশ্বপ্রেমিক। কোন বিশেষ জাতি বা দেশকে প্রাধান্য দেওয়া তাঁহাদের নীতিবিরুদ্ধ ছিল এবং তাঁহাদের গুরু পোপ ছিলেন সকল দেশেরই ধর্মোপদেষ্টা। শুধু তাহাই নহে—ক্রমশ তিনি রাজনৈতিক উপদেষ্টাও হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার মূলে প্রথম বিপ্লব ঘটিল প্রোটেষ্ট্যান্টিজ্‌মের অভ্যুদয়ে। তখন ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ। খৃষ্টধর্ম তখন প্রায় পোপের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্ম-যাজকদের মধ্যে নানাবিধ কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া মার্টিন লুথার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। পোপের সহিত তাঁহার ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ফলে মার্টিন লুথারের অধিনায়কত্বে ইয়োরোপে খৃষ্টধর্মের এক নূতন শাখার সৃষ্টি হইল। ইহাই প্রোটেষ্ট্যান্টিজ্‌ম্।

ইহার পরেই ইয়োরোপে নানা রাজ্যের মধ্যে ধর্ম লইয়া বিরোধ সুরু হইল। একদল পোপের পক্ষাবলম্বন করিল; অপরদল মার্টিন লুথারের প্রবর্তিত মত গ্রহণ করিল। সমস্ত ইয়োরোপের ধর্মগুরু হিসাবে সকলদেশের রাজার উপরেই পোপ আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড, জার্মানী এবং আরও অনেক দেশ খুবই গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল যে তাহাদের নিজেদের দেশের ধর্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তাহাদের রাজার—বাহিরের ধর্মগুরু পোপের নহে।

ইহাই হইল জাতীয়তার প্রথম উদ্ভব; কিন্তু ইহা সূচনা মাত্র। ইহাকে ঠিক জাতীয়তা বোধ বলা চলে না। কারণ,

বিভিন্ন জাতির জনসাধারণ ইহাতে একটুও উদ্বুদ্ধ হইল না। কয়েকজন রাজা নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া এই সুযোগে তাহার একটু সদ্ব্যবহার করিলেন মাত্র। জাতীয়তার ভিত্তি লোকের একত্ববোধ তখন পর্যন্ত জাগিল না।

লোকের চেতনা হইল ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে এবং তাহারা উঠিয়া বসিল বিপ্লবের পরে। রাজার যথেচ্ছাচারে এবং শাসনযন্ত্রের অত্যাচারে সারা ফরাসী দেশ ক্ষেপিয়া উঠিল —বিপ্লবের ধ্বজা উড়িল। ফরাসী দেশের জনসাধারণ দেখিল—একত্র হইয়া তাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। এবার তাহারা "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা"—এই বাণী প্রচার করিয়া সমগ্র ইয়োরোপকে তাহাদের পতাকার তলে সমবেত হইতে আহ্বান করিল।

যতক্ষণ পর্যন্ত ফরাসী দেশের লোকেরা তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণ সমস্ত ইয়োরোপ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ইয়োরোপের জনসাধারণকেও চঞ্চল ও আপনাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারাও তাহাদের দেশের শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন করিতে উদ্যোগী হইতেছিল। এমন সময়ে ফরাসী দেশে বিশ্ববিশ্রুত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের আবির্ভাব হইল। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার সম্মুখে বিপ্লবের সমস্ত ঢেউ থামিয়া গেল। অসামান্য বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে তিনি ধীরে ধীরে সমগ্র ফরাসী দেশের অধিনায়ক হইয়া

উঠিলেন। কিন্তু মাত্র ফরাসী দেশের অধিনায়কত্ব তাঁহাকে তৃপ্ত রাখিতে পারিল না। তাঁহার আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিমিত। ধীরে ধীরে তিনি রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সম্মুখে সমস্ত ইয়োরোপ মাথা নত করিল।

ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রে ইয়োরোপের জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। নেপোলিয়ান ইয়োরোপের রাজাদের পদানত করিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণকে পারিলেন না। তাহারা দেখিল—নেপোলিয়ন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পুরোহিত নহেন, তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়াসী। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের বুভুক্ষার সম্মুখে অন্য দেশ বা জাতির স্বাধীনতাকে বলি দিতে তাঁহার এতটুকুও কুণ্ঠা নাই।

প্রত্যেক দেশের নরনারীর একত্ববোধ প্রবল হইয়া উঠিল। একযোগে ইয়োরোপের জনসাধারণ তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়ানের বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া গেল। জাতীয়তার প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে আপনার পরাজয় স্বীকার করিয়া নেপোলিয়ান সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে চির কারাবাস মানিয়া লইলেন।

ইহার পর হইতেই জাতীয়তার প্রধান স্বরূপ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপের সমস্ত জাতি তাহাদের এই একত্ববোধকে দৃঢ়ীভূত করিতে উঠিয়া

পড়িয়া লাগিল। জার্মানী এতদিন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; সেখানে বিসমার্কের নেতৃত্বে বিশাল জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। এদিকে ইটালীর জাতীয়তা যজ্ঞে পুরোহিত হইলেন ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডি। ম্যাট্‌সিনি গভীর কণ্ঠে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করিলেন—অত্যাচারী অষ্ট্রিয়াকে দূর করিতে হইবে, ছোট ছোট প্রদেশগুলি সংঘবদ্ধ করিতে হইবে, সাম্য এবং স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাঁহার এই আহ্বানে সমগ্র ইটালি জাগিয়া উঠিল এবং এই যজ্ঞের সম্পূর্ণতা আনিল গ্যারিবল্ডির শৌর্য্য ও সাহস।

ইহাই হইল ইয়োরোপের জাতীয়তাবোধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আমাদের দেশের জাতীয়তাবোধের ইতিহাস আরও সংক্ষিপ্ত। ইংরেজদের এদেশে আসিবার পূর্বে যথার্থ জাতীয়তাবোধ আমাদের ছিল কিনা সন্দেহ। জনসাধারণের রাষ্ট্রগত একত্ববোধের সৃষ্টি হইয়াছে বৃটিশ শাসনের সংঘাতে—বৃটিশের সাহায্যে নহে, বৃটিশের বিরোধিতা সত্ত্বেও। আমাদের দেশের নানা ধর্ম, নানা জাতি, ও নানা ভাষা স্বভাবতই কোন দৃঢ় একত্ববোধের পরিপন্থী। বৃটিশের বলিষ্ঠ কূটনীতি এই স্বাভাবিক বিভিন্নতা আরও তীব্র করিয়া দিয়াছিল। তথাপি বিগত পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর ধরিয়া এই সব বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে যে একটি জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ বিচারকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমাদের সর্বজনীন দারিদ্র্য, আমাদের অভাব-অভিযোগ, আমাদের

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের দাবী—এ সমস্তই আমাদের জাতীয়তা-বোধকে সংহত ও প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং এই চেতনা ধীরে ধীরে আমাদের সমাজের ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সঞ্চারিত হইতেছে—অশিক্ষিত কৃষক এবং দিনমজুরও এই বিষ-সঞ্জাত অমৃত হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

'জাতীয়তা' কথাটির মধ্যে এমন একটি সম্মোহন শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে যে মানুষ স্বভাবতই ইহার কাছে মাথা নত করে। এই মহৎ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে সর্ববিধ ভোগ-বিলাস ও স্বার্থপরতা পরাজয় স্বীকার করে।

নিজের ব্যক্তিত্বের সহিত যখনই রাষ্ট্রের সংহত শক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তখনই মানুষ তাহার নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যগ্রতা অতি তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠে যখন সে দেখে—অনুভব করে যে রাষ্ট্রের পরিচালনায় তাহার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। রাষ্ট্রগঠন এবং রাষ্ট্রশাসনের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যের কিয়দংশ দিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং সেখানে বাধা পাইলেই সে রুদ্রমূর্তিতে তাহার নিজের অধিকার ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে। সে তখন নির্ভয়ে বলিয়া উঠে—মানুষে মানুষে বিরোধ দুঃখের মূল; মানুষের উপর মানুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কিংবা মানুষের দাসত্বই বিরোধের উৎস। ইহার প্রতিকারের দ্বারাই সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি ও আনন্দের আবির্ভাব হইতে পারে। এই সুখ, শান্তি ও আনন্দ সকল সভ্যতারই

কাম্য। সাম্য, মৈত্রী, এবং স্বাধীনতার বাণী তখন সে উদাত্ত কণ্ঠে সর্বত্র প্রচার করিতে থাকে।

আজকাল পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই আছে যাহারা সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন স্বাধীনতার লীলাভূমি ইয়োরোপেও বড় বড় মনীষীরা মানুষের এই অধিকারের দাবীতে বিচলিত হইয়া উঠিতেন—তাঁহারা ইহারই মধ্যে দেখিতেন রাষ্ট্রের বিনাশের সূচনায় প্রলয়ের আগমনী। এই বিচলিত হওয়াটা যে একেবারেই অহেতুক ছিল তাহাও বলা যায় না; কারণ মানুষের এই তিনটি অধিকারের দাবী সকলের আগে স্পষ্টভাবে করা হইয়াছিল একটি বিপ্লবের প্রারম্ভে যাহা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের বিপ্লবী-রাই সর্বপ্রথমে উচ্চ নির্ভীক কণ্ঠে "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার" দাবী করেন এবং ইহার বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচারিত করেন।

অথচ এই বিপ্লবের আগে ফরাসী দেশে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার নাম মাত্র ছিল না বলিলেও চলে। সমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত এবং বড় বড় লর্ড মার্কুইসরাই সমাজের ষোল আনা সুখ সুবিধা উপভোগ করিত—নিম্নস্তরের যাহারা তাহারা কোন প্রকারে দিনপাত করিত মাত্র। বংশ মর্যাদা বা ধনগৌরবে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকে কোন প্রকার কর বা

রাজস্ব দিতে হইত না। রাষ্ট্রের প্রায় সকল অর্থই আসিত নিম্নস্তরের লোকেদের নিকট হইতে। মৈত্রীর চিহ্নমাত্র ফরাসী দেশে ছিল না। সারা দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল—এক অংশের সহিত অপর অংশের সংযোগ এবং সম্বন্ধ ছিল অতি ক্ষীণ। এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে যাইতে হইলে প্রায় পঞ্চাশ প্রকারের বাধা অতিক্রম করিতে হইত। ইহার ফলে ফরাসীরা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল যে তাহারা একই জাতি এবং তাহাদের সুখ দুঃখ পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। সাম্য এবং মৈত্রীর যেখানে এতখানি অভাব সেখানে যে স্বাধীনতা ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। রাজা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী—তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবার শক্তি ছিল না কাহারও। পার্লামেন্ট একটা ছিল—তাহা নামে মাত্র। এক শত বৎসরেরও বেশী হইয়াছিল, তবুও রাজা একটিবারের জন্যও তাহা আহ্বান করেন নাই। এই States General নামক পার্লামেণ্টে জনসাধারণের কোন প্রতিনিধি ছিল না। তবু সেখানে জমিদার ও লর্ডরা আসিয়া রাজার যথেচ্ছ শাসনের অন্তরায় হইতে পারে—এই সম্ভাবনাটুকু মাত্র ছিল। ফল এই হইয়াছিল যে রাজার প্রিয় কয়েকজন অনুচরের হাতে শাসন বিভাগের সমস্ত কার্যের ভার ন্যস্ত থাকিত। তাহারা নানাভাবে দেশের লোকের উপরে অত্যাচার করিত; কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ই ছিল না। কারণে অকারণে কারাবরণ করা ফরাসী দেশের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতিবাদ

বা অভিযোগ করার কোন পন্থাই ছিল না; কারণ শাসন যন্ত্র এবং বিচার বিভাগ সমস্তই ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজার অনুগত।

এইরূপ অত্যাচার ও অসাম্য ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও ছিল; কিন্তু তথাপি বিপ্লব সুরু হইয়াছিল ফরাসী দেশে। ইহা প্রধানত সম্ভব হইয়াছিল দুই কারণে। প্রথমত, ফরাসী দেশের তদানীন্তন রাজা অন্যান্য দেশের রাজার মতই স্বেচ্ছাচারী থাকিলেও ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাঁহার অতি অল্প ছিল। তাই, দেশের লোকে যখন একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন তাসের ঘরের মত স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রটি এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। দ্বিতীয়ত বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী দেশে এমন কয়েকজন দার্শনিকের উদ্ভব হইয়াছিল যাঁহাদের অগ্নিমন্ত্রে সেখানে কয়েকজন উৎসাহী নেতার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহাদের নেতৃত্বে বিপ্লবটি সম্পূর্ণতা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইহার আরও একটি সাধারণ কারণ আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি। অত্যাচারের মাত্রা যখন পূর্ণ হইয়া পড়ে, মানবধর্মের গ্লানি যখন কানায় কানায় পূর্ণ হয় তখন সেই আহত মানবধর্মের রক্ষার জন্য ভগবানের বা ভগবৎ প্রেরিত মহাপুরুষের অন্যথা ভগবদ্‌বিহিত বিধি বা অবস্থার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে যাহা অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলে। তাই কৃষ্ণপক্ষের গাঢ়ান্ধকারে ঝঞ্ঝা-বাত্যার মাঝখানে অত্যাচারী কংসের যন্ত্রণাভরা কারাগারে কংস-নিসূদন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল এবং মন্ত্রবলে পিতামাতার শৃঙ্খল ছিন্ন

হইয়া মাটিতে লুটাইয়াছিল; সর্বদেশে সর্বকালে ইহা এই-ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে।

ষোড়শ লুই (Louis XVI) তখন ফরাসী দেশের সিংহাসনে। শতবর্ষব্যাপী অত্যাচার ও অসাম্যের বোঝায় দেশের লোক তখন প্রপীড়িত। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের মধ্যেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী লইয়া কয়েকজন লেখক ও মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাঁহাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াই ফরাসী দেশের জনসাধারণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়াছিল।

এই দুই মনীষীর নাম যথাক্রমে মণ্টেস্ক্ (Montesquieu) ও রুশো (Rousseau)। মণ্টেস্ক্ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (আনুমানিক ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে) একবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ফরাসী রাজ্যের একই অধিনায়কের করতলগত স্বেচ্ছাচারিতার পাশে ইংলণ্ডের সংযমশীলতা এবং ক্ষমতা বিভাগ (Separation of powers) তাঁহার কাছে এমন অভূতপূর্ব বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত Spirit of the laws (Esprit des Lois) গ্রন্থে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিকেই সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। মানুষের সাম্য ও স্বাধীনতা রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তখনই যখন একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিবদ্ধ থাকে না। ইহাই ছিল তাঁহার মূল নীতি।

ফরাসী রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন মণ্টেস্ক্। মানুষের রাষ্ট্রীক দাবী (Fundamental rights) দৃপ্ত কণ্ঠে যিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন তিনি রুশো। ফরাসী বিপ্লবে ভাবধারার অগ্রগামী পুরোধা হইয়াছিলেন এই রুশোই। মণ্টেস্ক্ ছিলেন শান্ত ও সমাহিত চিত্ত—ধীরে ধীরে শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন সাধনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু রুশো ছিলেন অগ্নিমন্ত্রের উপাসক। তাঁহার স্বপ্ন ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের তদানীন্তন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করিয়া নূতন ধরণের সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থাপনা, যাহার ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে মানুষের অব্যাহত সম্মতিতে (Free will) এবং যাহার শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত হইবে মানুষের স্বাভাবিক নিয়মানুবর্তিতায়।

রুশোর জীবন কথা উপন্যাসের মতই বিচিত্র ও বিস্ময়োৎপাদক। তাঁহার সারাটি জীবনের প্রায় সবটুকুই অতিবাহিত হইয়াছিল ভ্রাম্যমানের মত দেশ বিদেশ পর্যটনে। তাঁহার লিখিবার ভঙ্গী ছিল তীব্র অথচ উচ্ছ্বসিত, কল্পনাপূর্ণ অথচ সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য। তাই তাঁহার নাম ফরাসী বিপ্লবের বহু বৎসর পূর্বেই দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের জন্ম হইতেছে স্বাধীনতায়—অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্রই সে কোন না কোন প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে মাথা নত করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়—এই ছিল তাঁহার প্রধান অভিযোগ ও বক্তব্য। রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মানুষ ছিল সুখে, স্বাধীনতায়, শান্তিতে; সেই থাকাটাই ছিল তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তবু তাহাকে

সেই স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হইল; কারণ সে দেখিল রাষ্ট্রের অভাবে তাহার অনেকখানিই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কিন্তু তথাপি সে রাষ্ট্রের কাছে নিজের জন্মগত স্বাতন্ত্র্য বলি দিতে রাজী হইল না। সে বলিল—আমরা নিজেরাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিব—রাষ্ট্রের শক্তি হইবে আমাদের সম্মিলিত শক্তির প্রতিভূ এবং প্রতীক। এই ভাবে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল তাহাতে মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা এবং সাম্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় রহিল অথচ রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া তাহার নিজের বিশিষ্ট বৃত্তিগুলি বিকাশের পথও রুদ্ধ হইল না।

রুশোর এই আদর্শবাদের ছত্রে ছত্রে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি শ্রদ্ধার যে ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অত্যাচার-প্রপীড়িত জনসাধারণের বেদনা-বিদ্ধ ক্ষতস্থানে যেন ব্যথাহরণ প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহাদের বঞ্চিত ত্রস্ত অন্তর এক অপূর্ব শক্তিতে পূর্ণ করিয়াছিল।

মানুষ ক্ষুদ্র ছায়াতরু রোপণ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যায়। কালে সেই তরু তাহার দীর্ঘ-পত্রবহুল শাখা প্রশাখা চারিদিকে প্রসারিত করিয়া শীতাতপ, রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে বাঁচাইয়া স্নিগ্ধ ও বিশাল ছায়া রচনা করিয়া রাখে। কত পান্থ, কত দূরাগত সেখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ভাবে কোন্ সে ভাগ্যবান্ যিনি এই স্নিগ্ধ মনোরম ছায়াগৃহ রচনা করিয়া গিয়াছেন; কত বালক যুবা গ্রাম্য ক্রীড়ামোদে সেই সুশীতল ও মনোরম বৃক্ষতল রঙ্গমঞ্চের মতই সুখদ ও আনন্দপ্রদ করিয়া

তুলিয়াছে। গবাদি তৃণভোজী পশুরা সেখানে শুইয়া আনন্দে রোমন্থন করিতে করিতে বুঝি বা ভাবে যে তাহারাও সেই মহাপুরুষের দ্বারা অবজ্ঞাত হয় নাই। মণ্টেস্ক্ এবং রুশো দুজনেই বিপ্লব সুরু হইবার পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা যে আদর্শবাদের তরু রোপণ করিয়াছিলেন তাহা বৃদ্ধি পাইয়া জনসাধারণের সাড়া আনিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ অত্যাচারের হাত হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছিল। এই সময় হইতেই জনসাধারণ শাসন ভয় তুচ্ছ করিয়া প্রকৃত বিপ্লবী হইয়া উঠিয়াছিল। মণ্টেস্কের চিন্তাধারায় ফরাসী স্বেচ্ছাচারিতার রাজনৈতিক ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র; কিন্তু রুশোর অগ্নিমন্ত্রে সেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের নৈতিক এবং মানসিক ভিত্তি একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের বহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠিল, তখন রুশোর বাণী হইল জনসাধারণের আহুতির মন্ত্র। মানুষের সাম্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে সকলের মিলিত সম্মতির শ্রেষ্ঠতাই হইল বিপ্লবীদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, যে মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিপ্লবীরা স্বেচ্ছাতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল, নূতন রাষ্ট্র সংগঠন কালে তাহারা সে আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারিল না। যে নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাহারা সৃষ্টি করিল তাহার মধ্যে সাম্য হয়ত খানিকটা ছিল, কিন্তু মৈত্রী বা স্বাধীনতার চিহ্ন তাহার

মধ্যে ছিল না বলিলেও চলে। সিংহের পরিবর্তে ব্যাঘ্র আসিয়া বনানী অধিকার করিয়া বসিল। রাজার স্বৈরাচারের স্থলে দেখা দিল বিপ্লবীদের স্বৈরাচার। যাহারাই প্রতিবাদ করিতে আসিল, তাহারাই অসহিষ্ণু বিপ্লবীদের দ্বারা দেশ হইতে বিতাড়িত হইল বা কুখ্যাত গিলোটিনে (Guillotine) নিহত হইল। সারা ফরাসী দেশ ব্যাপিয়া এক বিভীষিকার যুগ আরম্ভ হইল। ফ্রান্সেই ইহার ভয়াবহ কার্য সীমাবদ্ধ রহিল না।

কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপ্লবীরা সমস্ত ইয়োরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দোহাই দিয়া তাহারা রাজা ষোড়শ লুই এবং রাণী আনাতোঁয়ানেতকে (Marie Antoinette) গিলোটিনের মুখে পাঠাইয়াছিল সে দিনের কথা তাহারা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেল এবং নিজেদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং রাজ-নীতি অন্য দেশের উপর নির্মমভাবে প্রয়োগ করিতে চাহিল। বাহিরের সহিত এই সংঘর্ষ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন কিন্তু সকলের মন আবার ছুটিয়া গেল সেই পুরাতন আদর্শবাদের দিকে। যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহারা একদা জাগিয়াছিল এবং যে দীপ্তোজ্জ্বল ছবি দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল লোকের মনে তাহাই জাগিয়া উঠিল। সকলেরই লক্ষ্য হইল কি করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রে আবার সেই আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

ফরাসী বিপ্লবে আর কিছু হউক, না হউক, পুরাতনের প্রতি অন্ধ ও অহেতুক শ্রদ্ধার ভাবটুকু কাটিয়া গিয়াছিল—লোকে সাহস করিয়া নূতন মন্ত্রে দীক্ষা লইতে সুরু করিয়াছিল। লোকে আরও বুঝিয়াছিল যে সাধারণের মধ্যে সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে মৈত্রী বা স্বাধীনতা কোন দিনই আসিবে না এবং স্বাধীনতা না আসিলে সাম্যবাদেরও দর্শন পাওয়া যাইবে না।

সারা উনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী ইতিহাস এই সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতাকে সত্যভাবে অর্জন করিবার প্রচেষ্টার এক বিচিত্র কাহিনী।

তাই ইহার পরে যখনই কোন নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি বা নূতন রাষ্ট্রের রচনা হইয়াছে তখনই বিপ্লবী মনীষী এবং রাষ্ট্রবিদ্‌গণ চেষ্টা করিয়াছেন ফরাসী বিপ্লবীদের এই মন্ত্রগুলি নিজেদের বিপ্লব ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে। মানুষের যে কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে তাহা ফরাসী বিপ্লবীরাই দৃপ্ত কণ্ঠে সর্ব-প্রথম প্রচার করিতে সাহস করিয়াছিল। তাহাদেরই দৃষ্টান্তে অনু-প্রাণিত হইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপয়িতৃগণ তাঁহাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সেই অধিকারগুলি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে যখনই কোন দেশে কোন নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তখনই এই সমস্ত অধিকারের এক সংক্ষিপ্ত তালিকা তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আমাদের দেশেও যখন নূতন বিপ্লব ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছিল তাহারও পশ্চাতে যে ফরাসী বিপ্লবীদের মন্ত্রের প্রেরণা ছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিকা

১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে বৃটিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর হইতে ভারতের জনগণ একশত বৎসর ধরিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে নানাস্থানে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়াছে। খণ্ড কাব্যের মত সেই সময়কার ইতিহাস অতুলনীয় বীরত্ব ও অসামান্য আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। সিরাজদ্দৌলা, মোহনলাল, হায়দার আলি, টিপু সুলতান, ভেলুতাপ্পি, আপ্পা সাহেব ভোঁসলা, পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, সর্দ্দার শ্যামসিং, আতিরিওয়ালা, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপি, ডুমরাওনের মহারাজা কুলোয়ার সিং, নানা সাহেব ইত্যাদি বহু বীরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। প্রথমে না বুঝিলেও ভারতের জনগণ পরে আপনাদের ভ্রম ও অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া সম্মিলিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালে বাহাদুর সাহের অধিনায়কত্বে তাহারা স্বাধীন জাতি হিসাবে যুদ্ধ করে। যুদ্ধের প্রথম ভাগ কয়েক ক্ষেত্রে জয়লাভ সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য এবং ভ্রান্ত নেতৃত্ব—ধীরে ধীরে তাহাদের চরম পরাজয় ও পরাধীনতা আনিয়া দিয়াছিল। তথাপি ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া টোপি, কুলোয়ার সিং ও নানা সাহেব জাতির গগনে দীপ্ত নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন।

বৃটিশ ইতিমধ্যে পশুবলে ভারতবাসীদের নিরস্ত্র করিয়া ভারতে আতঙ্ক ও পাশবিকতার রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্মের পর হইতে ভারতে নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল। সেদিন বাংলার নিকট হইতেই ভারতের অপরাপর প্রদেশ এই নবোন্মেষিত স্বাধীনতার উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিল। সেদিন বাংলাই প্রথমে জাগিয়াছিল ও পরাধীনতার তমসাচ্ছন্ন শ্মশানে একা মুক্তিমন্ত্র সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই জন্যই বাংলার স্বাধীনতার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা ও সজীবতা, বাংলার একনিষ্ঠ স্বাদেশিকতা ও ধর্মপ্রাণতা এবং বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তি ও শুদ্ধতা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছিল। সেদিন বাংলা অপরের মত প্রেয়ের পথে চলিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া আপনার বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী শ্রেয়ের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। বাংলার রাষ্ট্রীয় আদর্শ তাই চিরদিনই নান্যত্রসুলভ ভারতের মৌলিক একত্বের উপর আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠতম গুণ মানবহিতৈষণা ও বিশ্বহিতকামনার সহিত যুক্ত করিয়াছে। তাই আধুনিক স্বাদেশিকতা বা Nationalism-এর সত্য ও পূর্ণ আদর্শ কেবল বাংলা দেশেই প্রথমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই নূতন আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নানাদিকে নানা লোক নানা চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই নবীন সাধনার প্রথম যুগের প্রথম দীক্ষাগুরু ছিলেন তিন জন—রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ।

রাজা রামমোহন রায়ই বাংলার এবং বস্তুত সমগ্র ভারতেরই আধুনিক ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের গুরু। ইংরাজী শিক্ষায় ও ইংরাজের শাসনে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে এদেশে যে অভিনব আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভাই সম্যকরূপে তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই আদর্শকে স্বদেশের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া কিরূপে তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জীবনে আচরণ ও উপদেশের দ্বারা যে সর্বাঙ্গসুন্দর স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বিগত শত বৎসর ধরিয়া দেশের মনীষিগণ নিজ নিজ শক্তি ও সাধ্য অনুসারে সেই আদর্শেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। এই শতাব্দব্যাপী সাধনার ফলে সেই আদর্শ আজ স্ফুটতর হইয়াছে, কিন্তু এখনও সম্যকরূপে আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই।

এই সম্পূর্ণ যোগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ ও প্রকাশিত করিয়াও রামমোহন আপনার কর্মজীবনে বিশেষভাবে এই আদর্শের তত্ত্বাংশটুকুই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ও শক্তির অধিকাংশ যুগসঞ্চিত কর্মক্ষয় ও তাহার প্রাণহীন সংস্কার ও অর্থহীন কর্মজঞ্জাল পরিষ্কার করিতেই নিয়োজিত হয়। ধর্মের তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ উভয় অঙ্গকেই তিনি শোভিত ও সংস্কৃত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। একদিকে প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বনেই তিনি যেমন ধর্মকে সত্যোপেত ও

সময়োপযোগী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই সমাজ জীবনে পুঞ্জীভূত অহিতাচার দূর করিবার চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিও তাঁহার মমতার অভাব ছিল না। জনসাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার যাহাতে সম্প্রসারণ হয় সে দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহার কর্মজীবন এত বিপুল, ব্যাপক ও বহুমুখী হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন বিশেষ করিয়া ধর্মসংস্কারক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একান্ত ধর্মপ্রাণ কোন সমাজের মধ্যে যখনি কোন নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তখনই তাহাকে ধর্মের মধ্য দিয়াই অগ্রসর করিতে হয়। নতুবা সে আদর্শ সে সমাজের মর্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্যই রাজা রামমোহন নব যুগের সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিলেও তাঁহার কর্মশক্তির প্রভাব সংস্কার কার্যের উপরেই অধিক পড়িয়াছিল।

স্বাধীনতাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। ধর্মের তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে এই দুই দিকেই রাজা বিশেষভাবে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনার ও স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে রাজার আদর্শের যোগ ও মিল থাকিলেও. ইহা সর্বতোভাবেই সেই আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর ছিল। আর স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে রাজার যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহাই

তাঁহার স্বাধীনতার আদর্শের এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। রাজা বৈদান্তিক সাধনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য বৈদান্তিক মুক্তির আদর্শের সঙ্গে রাজা রামমোহনের স্বাধীনতার আদর্শের অতি নিগূঢ় যোগ ছিল। বেদান্ত মার্গ অবলম্বন করিয়া, ইদং প্রত্যয়বাচক সর্ববিধ অনাত্ম-বস্তুর ঐকান্তিক অধীনতা হইতে, অহং প্রত্যয়বাচক আত্ম-বস্তুকে মুক্ত করাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার ধর্মের শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা সকলই এই আদর্শের অনুযায়ী ছিল। রাজার বহুমুখী সাধনার প্রত্যেক ও সকল বিভাগের সঙ্গেই একটা অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ মোক্ষসম্পর্ক ছিল। আর এই মোক্ষ সম্বন্ধই রাজার আদর্শকে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। রাজার দেশপ্রচলিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার এই বৈদান্তিক আদর্শের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বেদান্ত সিদ্ধান্তের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও রাজা সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদ গ্রহণ করেন নাই। অন্যদিকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সগুণ ব্রহ্মবাদকেও একান্ত-ভাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর সিদ্ধান্ত ও রামানুজ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ভারতের প্রাচীন ঋষিপন্থার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপের উচ্চতম সামাজিক আদর্শের একটা অপূর্ব সঙ্গতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের পরবর্তী আচার্যগণের ন্যায় রামমোহন কি তত্ত্ব-

বিচারে, কি ধর্মসাধনে একান্তভাবে শাস্ত্রগুরুর অধিকার ও প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করেন নাই। কিয়ৎপরিমাণে মার্টিন লুথারের মত রাজা রামমোহনও শাস্ত্রনির্ধারণে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্ম আচার্যগণের ন্যায় শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই। আবার অন্যদিকে লুথারের ন্যায় রাজা শাস্ত্রার্থ নির্ধারণে সদ্গুরুর প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। এইজন্যই প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির—Scripture এবং Private judgement-এর মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই, রাজা আপনার সিদ্ধান্তে, শাস্ত্রার্থ বিচারে, সদ্গুরুর যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। আর এইরূপেই রাজা রামমোহন তত্ত্ব বিচারে ও ধর্মসাধনে ভারতের প্রাচীন এবং য়ুরোপের আধুনিক সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

যেমন তত্ত্ববিচারে ও ধর্মসংস্কারে, সেইরূপ আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তেও রাজা রামমোহন প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের সাধনার মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই আমাদিগের বর্তমান যুগ আদর্শকে সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও সার্বজনীন করিয়া

তুলিবার চেষ্টা করেন। সমাজ জীবনের শৈশবে জগতের সর্বত্রই সমাজের কর্মবিভাগ বংশমর্যাদার অনুসরণ করিয়া চলে। যে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করে, সেই বংশের পুরুষানুক্রমিক কর্ম ও অধিকারই সমাজ জীবনে তার নিজেরও কর্ম ও অধিকার হয়। যখন পিতা বা পিতৃব্য বা তাঁহাদের অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই প্রত্যেক শিশুর একমাত্র দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, পরিবারের বাহিরে যখন বাল্যশিক্ষার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখন কোনো ব্যক্তির পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণে জীবিকা উপার্জন করা একান্ত অসাধ্য না হইলেও নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিল সন্দেহ নাই। সে অবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের কুলধর্মই সমাজদেহে তাহার বিশেষ স্থান ও কর্ম নির্ধারণ করিত। আর সে সময়ে জনগণের কর্ম ও অধিকার ভেদ জন্মগত হইলেও প্রকৃতপক্ষে গুণ কর্মবিভাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজবিজ্ঞানের এই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশঃ।

এই সাধারণ সমাজতত্ত্বের উপরেই হিন্দুর বর্ণবিভাগ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু এই স্বাভাবিক কর্মবিভাগের সঙ্গে আশ্রম চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া এই বর্ণভেদের ভিতর দিয়াই যে অভেদ শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছেন, জগতের আর কোনো জাতি সমাজ জীবনের শৈশবে ও কৈশোরে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই আশ্রম ধর্মই প্রাচীন

হিন্দুসাধনার সমাজতত্ত্বের বিশেষত্ব। কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণাশ্রম ধর্মও যখন সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহায় না হইয়া তাহার অন্তরায়ই হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-স্বভাব-সুলভ সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ্রকৃতি-সুলভ রজোগুণ হারাইয়াও কেবল জন্মের দোহাই দিয়াই ব্রাহ্মণত্বের বা ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার ও মর্যাদা দাবী করিতে লাগিলেন, তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কল্যাণার্থে প্রাচীন কুলধর্মকে অতিক্রম করাই আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই জন্যই গীতায় ভগবান প্রথমে বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও শেষে, গুহ্যাদপি গুহ্যতম যে ধর্মতত্ত্ব তাহার অভিব্যক্তি করিয়া বলিলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

অতএব বর্ণাশ্রম প্রধান হিন্দুর সমাজতত্ত্বেও সর্বকর্ম-ন্যাসপূর্বক, মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়া, এই বর্ণাশ্রমের অধিকার অতিক্রম করিবারও প্রশস্তপথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ইহাই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর সমাজতত্ত্বের ও সমাজনীতির শেষ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত। রাজা এই সিদ্ধান্তের উপরেই আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন। কর্মসাধনই সামাজিক জীবনের উপজীব্য। কর্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে লাভ করাই

সমাজ জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভের জন্য প্রথমে ঐকান্তিক সমাজানুগত্য, তৎপরে সমাজের এই আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভগবানে সমাজবিধি নির্দিষ্ট সর্বপ্রকারের কর্মার্পণ, তার পরে মহাজনপদ আশ্রয় করিয়া এই সমাজানুগত্য বর্জন ও নিষ্কাম কর্মযোগ সাধন।—এই ত্রিপাদেতে হিন্দুর কর্মসিদ্ধান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগের হিন্দুয়ানী নিষ্কাম কর্ম বলিতে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ ফলভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, লোক সংগ্রহার্থে বর্ণাশ্রম বিহিত কর্মানুষ্ঠানই বুঝিয়া আসিয়াছে। এখনও অনেকে নিষ্কাম কর্ম বলিতে ইহাই বুঝেন। রামমোহন মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর আশ্রম বিরহিত, সুতরাং ধর্মহীন বর্ণভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্মজীবনের সংস্কার সাধনার্থে, প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়াই, লোক-শ্রেয়কে একমাত্র প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে তিনি প্রাচীন হিন্দু কর্মতত্ত্বকে একদিকে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র এবং অন্যদিকে সত্যভাবে স্বদেশী ও সার্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কি তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম সাধনে কিংবা সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে রামমোহন কোনো বিষয়েই আপনাকে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনা, সংস্কার ও সিদ্ধান্ত হইতে একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু এই উন্নত, উদার, একই সঙ্গে স্বদেশী ও সার্বজনীন যুগ-আদর্শ সাধনের যোগ্যতা এবং অধিকার তখনো দেশের লোকের জন্মায় নাই। রাজা আদর্শটাই দেখাইয়া দেন, কিন্তু সেই আদর্শ যেরূপ ক্ষেত্রে সাধন

করিয়া আয়ত্ত করা সম্ভব, তখনও সে অনুকূল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর একদিক দিয়া কেশবচন্দ্র এবং অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ এই অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুতের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

রাজা যে উন্নত ও উদার ভূমিতে দাঁড়াইয়া এই অভিনব যুগ আদর্শ প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমাজের সাধারণ চিন্তা ও ভাবকে সেই ভূমিতে লইয়া যাইতে হইলে, সর্বাদৌ তাহার সর্ববিধ পূর্ব সংস্কার নষ্ট করা আবশ্যক ছিল। প্রত্যেক গঠন কার্য্যের পূর্বেই কতকটা ভাঙ্গা আবশ্যক হয়। রাজাও যে কিছু ভাঙ্গেন নাই এমন নহে। কিন্তু তিনি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড়িয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুগ-সন্ধিকালে নূতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচলিত পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষেরা কেবল এই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না। কোথায় কিরূপে এই সংগ্রামের শান্তি হইবে, কোন্ সূত্র ধরিয়া পুরাতনের ও নূতনের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সাধন করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্যক্ দৃষ্টি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা পুরাতনের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিয়াই নূতনকেও আপনার সফলতার দিকে প্রেরণ করেন এবং নূতনের অভিষেক দিয়াই পুরাতনকেও সার্থক করিয়া তুলেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল মহাপুরুষের অনুবর্তী হইয়া সমাজক্ষেত্রকে তাঁহাদের প্রকাশিত যুগ আদর্শের

প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হ'ন, কোথাও তাঁহাদের এই মহাজন প্রতিভাসুলভ সম্যক্‌দর্শন থাকে না। থাকিলে, তাঁহারা যে বিশেষ কার্যে ব্রতী হ'ন সেই কার্যের সফলতারই ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেন। ফলতঃ প্রাকৃতজনের মধ্যে সম্যক্‌ দর্শন সচরাচর সংস্কার কার্যের গতিবেগকে একান্ত-ভাবে কমাইয়া দিয়া তাহাদিগের কর্মোদ্যমকে বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্যই সংস্কারের পক্ষে কর্মোৎসাহের যতটা প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টির ততটা প্রয়োজন নাই। একদেশ-দর্শিতা বেগবতী সংস্কার চেষ্টার জন্য একান্তই আবশ্যক। অতএব রাজা যে সমুন্নত যুগ আদর্শ প্রকাশিত করেন, সেই আদর্শের যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া সমাজক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কেশবচন্দ্রের প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত একদেশদর্শিনী সংস্কার-চেষ্টারই একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীকালে, রাজার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বদেশী সমাজে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের মধ্যে যে উদার ও উন্নত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা, তাঁর প্রথম বয়সে স্বল্পবিস্তর একদেশদর্শী ধর্ম ও সমাজসংস্কার কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, সকলেরই সত্যলাভের জন্য প্রথমে সর্ববিধ পূর্বসংস্কার বর্জিত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রের প্রামাণ্য, সদ্‌গুরুর মর্যাদা, সমাজ বিধানের ধর্মপ্রাণতা, এসকলকে স্বল্পবিস্তর অস্বীকার না করিলে,

মানসক্ষেত্র কদাপি সম্পূর্ণ সংস্কার বর্জিত ও নির্মল হইতে পারে না। এই সর্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোধ হইতেই ক্রমে খাঁটি ও সরল বিশ্বাস এবং সত্য আস্তিকবুদ্ধির সঞ্চার হয়। "নেতি" "নেতি" বলিয়াই "ইতিতে" পৌঁছিতে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে "নেতি" "নেতি" বলিয়া একেবারে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব শূন্য করিয়াই, পরে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বং খল্বিদংব্রহ্ম—এই মহাসত্যে উপনীত হইতে হয়। কেশবচন্দ্রের সমাজ ও ধর্মসংস্কার চেষ্টা রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া, প্রথমে এই "নেতির" পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। এ পথ শক্তির পথ সংযমের পথ নহে। ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আত্মবিলোপের পথ নহে। এ পথ ইংরেজিতে যাহাকে Independence বা অনধীনতা বলে তারই পথ। সত্য-স্বাধীনতার পথ নহে। এ পথে যাইয়া এক প্রকারের ফ্রিডমে (Freedom) পৌঁছান যায়, কিন্তু উপনিষদ যাহাকে স্বারাজ্য বলিয়াছেন সে বস্তু লাভ হয় না। এ পথ Rights-এর পথ, স্বত্বের পথ; Reconciliation-এর পথ বা সামঞ্জস্য ও শান্তির পথ নহে। কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ব্রতে ব্রতী হইয়া, এই স্বত্বের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা, গুরুর প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির স্বত্ব প্রতিষ্ঠা,—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের

কর্ম চেষ্টার মূল সূত্র ছিল। ধর্মের ও নীতির আবরণের দ্বারা সুসজ্জিত হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সমাজ ও ধর্ম-সংস্কার প্রয়াস সর্ব বিষয়ে এই ব্যক্তিগত Rights বা স্বত্বকেই জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর কেশবচন্দ্র ধর্মসাধনে ও সমাজ শাসনে যে ব্যক্তিগত অনধীনতার আদর্শকে জাগাইয়া তুলিয়া দেশের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই আদর্শকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া আপনার অনন্য প্রতিযোগী ঐতিহাসিক কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। আধুনিক যুগে কেশবচন্দ্রের পূর্বেই আমাদের দেশে এই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছিল। একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারে অন্যদিকে ডেভিড্ হেয়ার এবং ডি' রোজিওর শিষ্যগণ সমাজ-সংস্কারে অষ্টাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার বা Independence-এর আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি এক দিকে আপনার কর্ম জীবনে এই দুই সংস্কার স্রোতকে একীভূত করিয়া জীবনের সকল বিভাগে এই অনধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন এবং অন্যদিকে এতাবৎকাল পর্যন্ত কার্যত যে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার চেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ জীবনের বিচ্ছিন্ন কর্মোদ্যমের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইতেছিল, কেশবচন্দ্র সেইসকল বিচ্ছিন্ন শক্তিকেন্দ্রকে একত্রিত করিয়া দলবদ্ধ হইয়া এই সংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত হ'ন। মহর্ষি প্রাচীন

শাস্ত্র ও গুরুর প্রভুত্বই কেবল অস্বীকার করেন, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মার্থীকে আপনার স্বাভিমত কিংবা সংজ্ঞানের (Conscience) উপরে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র গুরু বর্জন করিয়া, উপাসকগণের ধর্মজীবন ও কর্মজীবন পরিচালনায় শাস্ত্র গুরুর প্রাচীন অধিকার মহর্ষির উপরেই অর্পণ করেন। প্রত্যেক সাধনার্থীকে আপন আপন স্বাভিমত ও সংজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজে একপ্রকারের সাধারণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ'ন। ধর্মসাধনে ব্যক্তি বিশেষের অসঙ্গত প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়াই কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ধর্ম ও সমাজসংস্কারে কেশবচন্দ্র যে কাজ করেন, আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে সুরেন্দ্রনাথও ঠিক সেই কাজটিই করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের সূচনার বহুদিন পূর্ব হইতেই এ দেশের ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে মূর্তিমন্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবধিই বাংলার এবং বিশেষত কলিকাতার সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বে-সরকারী ইংরেজ প্রবাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিয়া তাহার পরিবর্তন বা সংশোধনের চেষ্টা

করিতেন। সময় সময় রাজপুরুষগণ নিজেরাই উপযাচক হইয়া বিশেষ বিশেষ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেন। ঐ সময়েরই কাছাকাছি কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল সেকালের বাংলার মনীষিগণ সকলেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনভুক্ত ছিলেন। সেকালে ইঁহারাই আপনাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থাদির আলোচনা করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশের অভাব অভিযোগের কথা রাজপুরুষদিগের গোচরে প্রেরণ করিতেন। রাজপুরুষেরাও ইঁহাদিগকে জনমণ্ডলীর স্বাভাবিক অধিনায়ক বা Natural Leaders বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহাদিগের মতামতের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা সর্বদা জমিদারদেরই সভা ছিল। বাংলার, বিশেষত কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানের জমিদারগণের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই সভার জন্ম হয়। ইহার সভ্য এবং অধিনায়ক সকলেই জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল জমীদার ছিলেন না বটে, কিন্তু জমিদারী স্বত্ব-স্বার্থের পরিপোষক এবং জমিদার সমাজের মুখ-পাত্ররূপেই তিনি দেশের তদানিন্তন রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা জমিদারদিগের সভা হইলেও প্রয়োজন মত আপনাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী

দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বার্থসংরক্ষণে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের বিচার আলোচনায় জনসাধারণের ত কথাই নাই, শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষেও সাক্ষাৎভাবে যোগদান করিবার অধিকার ও অবসর ছিল না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার নেতৃবর্গ জমিদারী স্বত্ব-স্বার্থের সঙ্গে মিলাইয়া যতটা সম্ভব দেশের সাধারণ লোকের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে একযোগে কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মসাধনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং রাষ্ট্র শক্তিকে জাগাইয়া সংহত লোকমতের দুর্জয় শক্তি প্রয়োগে রাজপুরুষদিগের স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এ পর্যন্ত কোনো চেষ্টাই হয় নাই। অথচ দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা বলবতী আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল।

ফলত যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া প্রাচীন সমাজের শাসন ও পুরাগত ধর্মের বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে ধর্মদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী করিয়া তুলে, তাহাতেই আবার তাঁহাদিগের প্রাণে এক নূতন স্বদেশাভিমানের সঞ্চার হয়। আমাদের সেকালের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার চেষ্টা বহুল পরিমাণে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল সত্য। কিন্তু ইহা সত্বেও যে এই সকল সংস্কার চেষ্টার অন্তরালে একটা প্রবল স্বদেশাভিমানও জাগিয়া উঠিতেছিল ইহাও

অস্বীকার করা যায় না। য়ুরোপীয় সমাজের তুলনায় আমাদের নিজেদের সমাজ-জীবন অতিশয় হীন, এবং য়ুরোপের যুক্তিবাদের তৌলদণ্ডে আমাদিগের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধনা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়াই বোধ হইত। আর হীনতা বোধ সর্বদাই আমাদিগের স্বদেশাভিমানে অত্যন্ত আঘাত করিত। এই বেদনার উত্তেজনাতেই আমরা তখন এতটা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাদের ধর্মের ও সমাজের সংস্কার সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এই সংস্কার চেষ্টা যদি সর্বতোভাবে খৃষ্টীয়ানীপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে সেই চেষ্টার ফলে আমাদিগের মধ্যে কোন প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু যে ব্যক্তিত্বাভিমান বা Individualism এবং যুক্তিবাদ বা Rationalism আমাদিগকে নিজেদের সমাজের ও ধর্মের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিতে প্রণোদিত করে, তাহারই প্রভাবে আমাদিগের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং য়ুরোপীয় সমাজবিধানের বশ্যতা-গ্রহণও একান্তই অসাধ্য করিয়া তুলে। স্বদেশের বেদপুরাণাদিকে মনুষ্য প্রতিভা রচিত এবং সাধারণ মানব-বুদ্ধি-সহজ ভ্রম-কল্পনা-প্রসূত বলিয়া, প্রামাণ্য-মর্যাদা নষ্ট করিয়া খৃষ্টীয়ানের বাইবেলকে ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার আর কোন পথ রহিল না। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব উড়াইয়া দিয়া যীশু খৃষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করা অসাধ্য হইল। অথচ এইরূপ অবস্থাতেও যখন খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম প্রচারকেরা হিন্দু-

ধর্মের উপরে নিজেদের ধর্মের আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সপ্রমাণ করিতে যাইয়া প্রতিবাদী ধর্মের মত ও বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত ও সাধনার হীনতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহাদের এই অযথা নিন্দাবাদের ফলেই,—যে স্বদেশের ধর্মকে এককালে আমরা হীন বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলাম, তাহারই সম্বন্ধে ক্রমে আমাদিগের প্রাণে একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগিয়া উঠিল। মানুষ এজগতে নিজের প্রাণের মধ্যে যে ভাব লইয়া অপর মানুষের নিকটে যায়, তাহার প্রাণেও অলক্ষিতে সেই ভাবেরই সঞ্চার করে। প্রেম এইজন্য প্রেমকে ফোটায়। ঘৃণা ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দেয়। একের অহঙ্কার অভিমান, অপরের অহঙ্কার অভিমানে আঘাত করিয়াই তাহাকে জাগাইয়া তুলে। মানবপ্রকৃতির এই নিয়মবশে খৃষ্টীয়ান ধর্ম-প্রচারকদিগের অসঙ্গত ধর্মাভিমান আমাদিগের অন্তরে স্বদেশের ধর্মসম্বন্ধেও একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগাইয়া দিল। যাঁহারা একদা স্বদেশের প্রচলিত ধর্মের সংস্কার কার্যে ব্রতী হইয়া স্বদেশবাসীগণের নিকটে নিয়তই সেই ধর্মের ভ্রম-প্রমাদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এখন তাঁহারাই আবার জগতের অপরাপর ধর্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া আপনাদের প্রাচীন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান্ হইলেন। এইরূপে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু, ইহাঁরা সকলেই একদিকে যেমন প্রচলিত ক্রিয়াবহুল হিন্দু-ধর্মের সংস্কারের চেষ্টা করেন সেইরূপ অন্যদিকে, বিদেশীয়

প্রতিবাদিগণের সমক্ষে এই ধর্মেরই সনাতন-তত্ত্ব ও চিরন্তন আদর্শের অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন করেন। আপনাদিগের পুরাতন ধর্মের যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে ক্রমে জাগিয়া উঠে তাহারই উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalism-এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বহুবিধ মানসিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নবোদিত স্বাদেশিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ইংরেজি শিক্ষার অনুপ্রাণনে এই নূতন স্বাদেশিকতার উৎপত্তি হয় সেই শিক্ষারই বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে দেশের নব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে নানা বিষয়ে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা জন্মিতে আরম্ভ করে। এই প্রতিযোগিতা নিবন্ধন একদিকে এক অভিনব স্বদেশপ্রীতি এবং অন্যদিকে একটা বিজাতীয় পরজাতি বিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। তদানিন্তন বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নূতন স্বজাতি-বাৎসল্য ও পরজাতি-বিদ্বেষ দুই-ই মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন"-এর প্রতিষ্ঠা করেন। নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বঙ্গদর্শন স্বদেশের প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি জাগাইয়া, এই নবজাত স্বদেশ প্রীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দ্র চন্দ্র, রঙ্গলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন প্রভৃতির কবি-প্রতিভা নানা দিকে ও নানাভাবে এই স্বদেশা-

ভিমানকে ফুটাইয়া তুলে। হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত," সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়, হোক ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়", গোবিন্দচন্দ্রের "কত কাল পরে, বল ভারত রে" এবং প্রাচীন স্মৃতি বাহিনী "যমুনা লহরী" মনোমোহনের "দিনের দিন সবে দীন" —এই সময়েই এই সকল জাতীয় সঙ্গীত প্রচারিত হয়। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ইহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। উপেন্দ্র নাথের "শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নীলদর্পণের মর্মঘাতিনী উদ্দীপনাতে নূতন ইন্ধন সংযোগ করিয়া দেয়। নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গরঙ্গ-মঞ্চও পুনঃ পুনঃ এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া ইহাদিগের শিক্ষা এবং উদ্দীপনাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। এই সময়েই নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হইয়া দেশের নবজাত স্বদেশ প্রীতিকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। "ভারত মাতা" প্রভৃতি নূতন গীতি-নাট্য এই অভিনব স্বদেশ-প্রীতিকে এক নূতন দেবভক্তির আকারে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-ভক্তির সুরধুনী-স্রোত যখন শিক্ষিত বঙ্গসমাজের প্রাণকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন চেতনার সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে, তখন এই স্বাদেশিকতার তরঙ্গমুখে, এই নূতন দেশচর্যার পুরোহিত রূপে, সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। আর দৈবকৃপায় দেশ-কাল-পাত্রের এরূপ শুভ যোগাযোগ ঘটিয়াছিল

বলিয়াই, তাঁহার কর্মজীবন এমন অনন্যসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

কোনো দেশে যখনি কোনো নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সর্বাদৌ তাহা উদারমতি, বিষয়বুদ্ধিহীন উদ্যমশীল যুবক মণ্ডলীর চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশের এই নবজাত স্বদেশ-প্রেমও সর্বপ্রথমে শিক্ষার্থী যুবকগণের চিত্তকে অধিকার করে এবং তাহাদের যৌবনস্বভাবসুলভ কল্পনা ও ভাবুকতাকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে। আর এই জন্য এই অভিনব স্বাদেশিকতা প্রথমেই কোন প্রকারের বস্তুতন্ত্রতাও লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী সাহিত্যিকগণ বঙ্গদর্শনের সাহায্যে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের নূতন স্বাদেশিকতাকে একটা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন সত্য। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের এবং সাধারণ সভ্যতার ও সাধনার লুপ্ত গৌরবের উদ্ধারে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহার পূর্বতন রাষ্ট্রীয় জীবনের আলোচনায় সে পরিমাণে মনোনিবেশ করে নাই। বিশেষত দেশের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচার আলোচনা কখনই প্রকাশ্য ভাবে বঙ্গদর্শনে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। "কমলাকান্তের দপ্তর"-এ লেখকের অসাধারণ শ্লেষালঙ্কারে আচ্ছাদিত হইয়া আধুনিক ভারতের অনেক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও

আদর্শেরই গভীর আলোচনা রহিয়াছে সত্য; কিন্তু অতি অল্প লোকেই সে সময়ে "কমলাকান্তের" সুমধুর বিদ্রূপাত্মক সুরসিকতার নিগূঢ় মর্ম-উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নব্য শিক্ষাভিমানী লোকেও কেবল তাঁহার অপূর্ব সাহিত্যরসটুকুই আস্বাদন করিতেন, লেখকের অদ্ভুত কৌতুককুশলতা এবং অসাধারণ শব্দসম্পদ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু এসকল ছলাকলার অন্তরালে যে গভীর সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব লুকাইয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভ করেন নাই। এই সকল কারণে, বঙ্গদর্শন নানাদিক দিয়া আমাদিগের নবজাত স্বাদেশিকতাকে পরিপুষ্ট করিয়াও, ইহাকে বিশেষ ভাবে বস্তু-তন্ত্র করিয়া তুলিতে পারে নাই। সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে এই স্বাদেশিকতার মধ্যে এক অভিনব এবং উন্মাদিনী ঐতিহাসিকী উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।

বৎসর পঞ্চাশ পূর্বে আমাদিগের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে কিয়ৎ পরিমাণে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া হইত বটে, কিন্তু সে সকল ইতিহাস ইংরেজেরই রচিত ছিল। সেকালে য়ুরোপের ইতিহাস বলিতে লোকে কেবল কতকগুলি রাজার নাম এবং তাঁহাদের যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণই বুঝিত। ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গ, ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে যে মানব-প্রকৃতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার আত্মচরিতার্থতা লাভের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান থাকে, এক যুগের ইতিহাস

যে পরবর্তী যুগের জনমণ্ডলীর কর্মজীবনের উদ্দীপনার ও শিক্ষার মূল সূত্রগুলি আপনার পশ্চাতে তাহাদিগের জন্য রাখিয়া যায়, এ সকল কথা সে কালের য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও ভাল করিয়া ধরেন নাই। ঐতিহাসিক আলোচনার এই পদ্ধতি তখনো ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং আমরা সে সময়ে স্কুল কলেজে যে সকল ইতিহাস পাঠ করিতাম, তাহার ভিতরে কোনো উন্নত আদর্শ কিংবা কর্মের উদ্দীপনা আছে, ইহা অনুভব করিতে পারি নাই। আর এই কারণেই যদিও ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের—আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন গ্রীস্, রোম ও মধ্যযুগের য়ুরোপখণ্ডের ইতিহাসও পাঠ করিতাম, কিন্তু এ সকল আমাদিগের প্রাণে কোনো প্রকারের সজীব স্বদেশ প্রেমের কিংবা উদার মানব-প্রেমের সঞ্চার করিতে পারিত না। সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সর্বপ্রথমে আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই যে সেই জাতির স্বদেশভক্তির আলম্বন ও প্রতিষ্ঠা এই সত্য প্রচার করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সঙ্গে একযোগে সর্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দকে লইয়া এক ছাত্রসভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্রসভাই তাঁহার স্বাদেশিক কর্মের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। যে অলোকসামান্য বাগ্মিতা শক্তির প্রভাব ক্রমে সমগ্র ভারতের নব্যশিক্ষিত

সম্প্রদায়ের চিত্তকে অধিকার করিয়া তাঁহার অনন্যপ্রতিযোগী ঐতিহাসিক প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কলিকাতার এই ছাত্রসভাতেই তাহা সর্ব প্রথমে স্ফুরিত হয়। এই ছাত্র-সভায় সুরেন্দ্রনাথ "শিখ শক্তির অভ্যুদয়—The Rise of the Sikh Power"—সম্বন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার স্মৃতি,—সেই বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের চিত্ত হইতে কখনই লুপ্ত হইবেনা। শিখ ধর্মের উৎপত্তি, শিখ খালসার প্রতিষ্ঠা, প্রথমে মোগল ও পরে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে শিখ খালসার যুদ্ধ বিগ্রহের কথা, সেকালের স্কুলপাঠ্য ভারত ইতিহাসের মধ্যেও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই সকল পূর্বপরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্ট্র-প্রীতির যে শক্তিশালিনী উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তড়িত-সঞ্চারিণী বাগ্মী-প্রতিভাই সর্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহা ফুটাইয়া তুলে। সেই হইতেই এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানস চক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি আধুনিক ভারতক্ষেত্রে যে এক বিশাল হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার মর্যাদাজ্ঞান তখনো আমাদের জন্মায় নাই। সুতরাং সে সময়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উদ্দীপনা আমাদিগের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের এই নূতন

স্বাদেশিকতা তখন একটা কল্পিত বিশ্বজনীনতার ভাব অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটা স্বদেশাভিমান মাত্র আমাদের চিত্তকে তখন অধিকার করিয়াছিল। হিন্দু বলিয়া কোনো গৌরবাভিমান তখনো আমাদের মধ্যে জন্মায় নাই। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত প্রাণহীন কর্মকাণ্ডে আমাদের পুরুষানুগত বিশ্বাস একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। জাতিভেদ প্রপীড়িত হিন্দুসমাজের প্রতিও গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই সকল কারণে ছত্রপতি মহারাজা শিবাজী ভারতে যে মহা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার প্রকৃত মর্ম ও উন্নত মর্যাদা উপলব্ধি করিবার অধিকার আমাদের ছিল না। অন্য পক্ষে বাবা নানক প্রবর্তিত ধর্মে একদিকে যেমন কোনো প্রকারের কর্মবাহুল্য ছিল না, অন্যদিকে সেই রূপ গুরুগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে জাতিবর্ণগত কোনও বৈষম্য ছিল না। শিখ খালসা বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডের পিউরিট্যান (Puritan) সাধারণতন্ত্রের বা Commonwealth-এর অনুরূপ ছিল। আর এই জন্যই আমাদের ইংরেজি শিক্ষা য়ুরোপীয় সাধানায় অভিভূত-চিত্তকে শিখ ইতিহাসের উদ্দীপনাতে এমন প্রবলভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিল। টডের রাজস্থান ইহার অনেক পূর্বেই রচিত হইয়াছিল বটে এবং রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপখ্যানের ভিতর দিয়া রাজপুত সমাজের অলৌকিক স্বদেশচর্যার উদ্দীপনা বাংলা সাহিত্যেও প্রবেশ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু পদ্মিনীর উপাখ্যান যে একান্তই "পৌরাণিকী" কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত

নহে, এই জ্ঞান তখনো খুব পরিপুষ্ট হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের মুখে শিখ ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু রাজপুতনার কীর্তি কাহিনীর উপরেও গিয়া পড়িল। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথই সর্ব প্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা করেন।

যেমন ভারতের ইতিহাস পড়িয়াও আমরা এতাবৎকাল পর্যন্ত তাহা হইতে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেইরূপ য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়িয়াও তাহার ভিতরে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মীপ্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনির দৈবীপ্রতিভা, গ্যারীবল্ডীর স্বদেশ-উদ্ধারকল্পে অদ্ভুত কর্মচেষ্টা, য়ূন ইতালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের এবং নব্য আয়র্লণ্ডের (New Ireland) আত্মোৎ-সর্গপূর্ণ দেশচর্যা, এসকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি কল্পনা ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।

এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ যে স্বদেশ-প্রীতিকে আশ্রয় করিয়া আপনার রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনের প্রতিষ্ঠা করেন, প্রথমাবধি সমগ্র ভারতবর্ষই তাহার উপজীব্য ছিল। বাঙালীর প্রকৃতির এবং বাংলার ইতিহাসের বিশেষত্ব হইতেই আমাদিগের স্বদেশপ্রীতির এই অপূর্ব উদারতার উৎপত্তি হইয়াছে। এই আধুনিক স্বাদেশিকতা এ পর্যন্ত বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব এই তিন প্রদেশেই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ইংরেজ এদেশে না আসিলে ভারতরাষ্ট্রে মারাঠা ও শিখ ইঁহারাই সম্ভবতঃ মোগলের উত্তরাধিকারী হইয়া দেশের শাসন শক্তিকে অধিকার করিয়া বসিতেন। বৃটিশ প্রভুশক্তির প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের সে আশা নির্ম্মূল হইলেও তাহার স্মৃতি শিখ বা মারাঠার চিত্ত হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। আর এই কারণে পাঞ্জাবের কিম্বা মহারাষ্ট্রের স্বাদেশিকতার মধ্যে একটা প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্ব লুকাইয়া আছে। বাংলায় সেরূপ কোনো ঐতিহাসিক স্মৃতি নাই বলিয়াই, বাঙালীর স্বাদেশিকতার কোন প্রাদেশিক আশ্রয়ও নাই। অন্যদিকে বাঙ্গালীর প্রকৃতিও শিখ বা মারাঠার প্রকৃতির মত নহে। শিখ খাল্‌সা ভারতমাতার বাহুতেই বল সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু বিশেষভাবে তাঁহার বাণীশক্তি অধিকার করিতে পারে নাই। অন্যদিকে মারাঠা ও বাঙ্গালী ইহাদের বুদ্ধিবল ভারতের অপরাপর জাতির বুদ্ধিবল হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও বাঙ্গালার বুদ্ধিতে ও মারাঠার বুদ্ধিতে প্রভেদও বিস্তর। মারাঠার বুদ্ধি

কার্যকরী, (practical) বাঙ্গালীর বুদ্ধি ভাবময়ী, (idealistic) বলা যায়। কার্যকরী বুদ্ধি ফলসন্ধিৎসু—কর্মাকর্মের আসন্ন ফল লক্ষ্য করিয়া চলে। ভাবময়ী বুদ্ধি সত্যসন্ধিৎসু; কর্মা-কর্মের প্রত্যক্ষ ফলাফলকে অগ্রাহ্য করিয়া ভাবরাজ্যে ও তত্ত্বাঙ্গে তাহার কি পরিণাম ঘটিবে তাহাই কেবল দেখে। কার্যকরী বুদ্ধি আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া বাস্তবকে ধরিতে চাহে। ভাবময়ী বুদ্ধি বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া আদর্শেতেই আত্মসমর্পণ করে। ভাবময়ী বুদ্ধি দেশচর্যা ও দেশভক্তিকে সর্বপ্রকারের প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া উদার ও সার্বজনীন করিতে চাহে। রাষ্ট্রীয় জীবনে কার্যকরী বুদ্ধি আসন্নফলসন্ধিৎসু politician-এর বা রাজনীতিকের সৃষ্টি করে। আর ভাবময়ী বুদ্ধি দূরদর্শী ও সম্যকদর্শী নীতিজ্ঞ statesman-এরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রের ও বাংলার কর্মজীবনের তুলনায় এই দুই জাতীয় মানববুদ্ধির ভেদাভেদের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

আর বাঙ্গালীর প্রকৃতির গুণে এবং আধুনিক বাংলার ইতিহাসের কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় গৌরব স্মৃতির অভাবে, আমাদিগের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতা যেমন সমগ্র ভারতবর্ষকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইরূপ বাঙ্গালী কর্মনায়ক সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় কর্মজীবন ও সমগ্র ভারতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়াই গড়িতে আরম্ভ করে। সুরেন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কর্মচেষ্টা প্রাদেশিক শাসনের ভালমন্দ

লইয়াই বিব্রত এবং প্রাদেশিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কবি-কল্পনাতে এবং সংবাদপত্রেই কেবল ভারতের রাষ্ট্রীয় একত্ববোধের কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইত; নতুবা এক প্রদেশের সুখ দুঃখ অন্যপ্রদেশের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিত কিনা সন্দেহ। কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান-সভা, পুণার সার্বজনীক সভা ও মান্দ্রাজের মহাজন সভা, এ সকলই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উদ্যোগে যে ভারত সভার বা Indian Association-এর জন্ম হয়, তাহাই সর্বপ্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম ও চিন্তাকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক বিশাল কর্মজালে আবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই ভারতসভার জন্ম হয় এবং অল্পদিন মধ্যেই উত্তরভারতের বড় বড় সহরে শাখা সভা সকল গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রয়াগ কানপুর মীরাট ও লাহোরে শাখা-ভারতসভার প্রতিষ্ঠা হয়। আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়শক্তিকে সংহত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, অর্ধশতাব্দী পূর্বে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই প্রকৃত পক্ষে সর্ব প্রথমে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করে। যে স্বদেশাভিমানকে আশ্রয় করিয়া ভারত-সভা দেশের রাষ্ট্র শক্তিকে বাড়াইয়া ও গড়িয়া তুলিতেছিল, কংগ্রেসের জন্ম নিবন্ধন যদি তাহা একান্ত বহির্মুখীন হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ

প্রজাশক্তি কতটা পরিমাণে যে সংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত তাহা এখন কল্পনা করাও সুকঠিন।

ফলত কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারত-সভার কর্মনায়কগণ একটা বিরাট জাতীয় সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা করেন। এই আদর্শের অনুসরণেই নানাস্থানে শাখা ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আর কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে চতুর রাষ্ট্রনীতিক লাট ডফ্‌রিনের যে কতকটা সম্বন্ধ ছিল, ইহা এখন সকলেই জানেন। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ দেশে যে বিপুল প্রজাশক্তি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, এ কথা বলাও কঠিন। বোম্বাইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হইতেছিল, সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন ভারত-সভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় একটা জাতীয় সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের সমকালেই কলিকাতার আলবার্ট হলে জাতীয় সমিতির বা National Conference এর অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের সংবাদ রাখিতেন কিনা, জানিনা। কিন্তু এই (Conference) কনফারেন্সে দেশের নানাস্থান হইতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁরা যে কংগ্রেসের কথা কিছুই শুনেন নাই ইহা জানি। ইহারা সকলেই এই National Conference-কে ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার এবং ভবিষ্যৎ প্রজা-শক্তির আধার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। আর কংগ্রেস

যদি সহসা এই স্থানটি পূর্ণ করিতে অগ্রসর না হইত, তাহা হইলে আজ সুরেন্দ্রনাথের এই National Conf : আমাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম শক্তিকেন্দ্র হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ভারত গভর্ণমেণ্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান সেক্রেটারী অ্যালান হিউম। ইহার পৃষ্ঠপোষক কলিকাতার প্রবীণতম ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইএর প্রবীণতম কৌন্সিলী ফিরোজসা মেহেতা, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ উকীল সুব্রহ্মণ্য আয়ার। কংগ্রেস এইরূপে প্রথম হইতেই অসাধারণ পদবল ও ধনবলের উপরেই প্রতিষ্ঠালাভ করে। সুরেন্দ্রনাথের কর্মচেষ্টার অন্তরালে তখন এ দু'য়ের কিছুই ছিল না। সুতরাং কংগ্রেস যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত National Conference-কে সহজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য নহে। আর ইহাতে প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষতি হইয়াছে, না লাভ হইয়াছে বলা কঠিন নহে। কংগ্রেস যতটা রাতারাতি বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের কন্‌ফারেন্সের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। অন্যদিকে সুরেন্দ্র নাথের এই কর্মচেষ্টা যদি কংগ্রেসের দ্বারা এইরূপে ব্যাহত না হইত তাহা হইলে দেশে আজ যে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় জীবন ও লোকমত গড়িয়া উঠিত, কংগ্রেস তাহা যে কেবল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ-ভাবে তাহার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভারতের

জেলায় জেলায় লোকমত সংগঠনের জন্য যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন সেগুলির শক্তি হরণ করিয়া কংগ্রেস দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জীবনকে যে দুর্বল করিয়াছে ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কংগ্রেসের প্রধান কীর্তি দুটী—এক লর্ড ক্রসের ১৮৯১ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাক্‌ট, আর অন্য লর্ড মর্লের আধুনিক কাউন্সিল সংস্কার। কিন্তু দেশের জেলায় জেলায় যে সকল রাষ্ট্রীয় সভা গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাকে নষ্ট করিয়া দেশের কংগ্রেস দেশের যে ক্ষতি করিয়াছে এ সকলের কিছুতেই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না। ফলত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্মচেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথের অনন্য প্রতিযোগী অধিনায়কত্ব লাভের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে সুরেন্দ্রনাথ কিয়ৎপরিমাণে কংগ্রেসের অর্থশালী নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া, আপনি প্রথমে যে পথে চলিয়া দেশের প্রজা-শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, সে পথ অনেকটা পরিত্যাগ করিয়া, বহুল পরিমাণে আপনার কর্ম জীবনের সম্পূর্ণ সফলতার ও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইতিহাস

লর্ড কার্জন যখন ভারতের শাসনকর্তা তখন তাঁহার কুটিল রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে তিনি বঙ্গভঙ্গের কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন এবং পূর্ববঙ্গে ভ্রমণকালে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথম একটি খসড়া প্রস্তাব সাধারণের বিবেচনা ও সমালোচনার জন্য প্রচার করা হয়। ইহাতে আসাম প্রদেশের আয়তন কিছু বর্ধিত করা হইয়াছিল এবং একদিকে বঙ্গদেশ অপরদিকে মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্তেন কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছিল। ইহার ফলে বঙ্গপ্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় এককোটি দশলক্ষ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা ছিল। এই প্রস্তাব অধিকারীদের মনঃপূত না হওয়ায় নাকচ হয় এবং ইহার পরিবর্তে একটি বৃহত্তর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়—ইহার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে এই প্রস্তাব কার্যকরী হইলে বঙ্গপ্রদেশের শাসনকর্তার শাসনভার প্রয়োজনীয়রূপে লঘু হইবে। উপরন্তু ইহা দ্বারা যে অঞ্চল বঙ্গ প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে তাহার অধিবাসীদের আইনসঙ্গত স্বার্থরক্ষাসম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব হইবে।

এই প্রস্তাবে আসাম প্রদেশের সহিত বঙ্গপ্রদেশের

পূর্বাঞ্চল সংযুক্ত করিয়া এক লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরের প্রদেশ গঠিত হয় এবং ইহাকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে অভিহিত করা হয়।

সীমান্ত পরিবর্ত্তনের পূর্বে আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল ষাট লক্ষ। নবগঠিত প্রদেশের জনসংখ্যা হইল তিন কোটি দশ লক্ষ। মুসলমানের সংখ্যা হইল এক কোটি আশী লক্ষ এবং হিন্দুর সংখ্যা হইল এক কোটি বিশ লক্ষ। বঙ্গপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের সীমান্তেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইল আর ওড়িয়া ভাষাভাষা সম্বলপুর জেলা মধ্যপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উপপ্রদেশ উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত হইল। পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওড়িয়া দেশী রাজ্যও উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত হইল। পাঁচটি হিন্দি ভাষাভাষী দেশী রাজ্য বঙ্গপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মধ্যপ্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইল। এইরূপে নবগঠিত বঙ্গপ্রদেশের আয়তন হইল একলক্ষ একচল্লিশ হাজার বর্গমাইল। আর জনসংখ্যা হইল পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ। ইহার মধ্যে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা হইল চার কোটি কুড়ি লক্ষ এবং মুসলমানের সংখ্যা হইল নব্বই লক্ষ।

পূর্বে বঙ্গপ্রদেশের ক্ষেত্রফল ছিল এক লক্ষ উননব্বই হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ; সুতরাং এই সীমান্ত পরিবর্ত্তনের ফলে বঙ্গপ্রদেশ হারাইল চল্লিশ হাজার বর্গমাইল ভূমি এবং দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ অধিবাসী।

এই প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ায় তখন বাঙালী জাতির সমবেত শক্তিকে নষ্ট করা ও পূর্ববঙ্গে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করাই এই বঙ্গচ্ছেদের গূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া স্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্র প্রকাশ করিলেন।

বঙ্গচ্ছেদের সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইবামাত্রই বাঙালী জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গভীর মনোবেদনায় চারিদিকেই কূটনীতির প্রতিবাদ হইতে লাগিল। কলিকাতায়, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সমস্ত দেশের উপর দিয়া কি এক বিষাদের বন্যা বহিতে লাগিল। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে বিলাতে ভারত সচিব বঙ্গচ্ছেদ মঞ্জুর করিয়াছেন। তুমুল আন্দোলনে ও আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হইল না দেখিয়া, বাঙালী আহত সিংহের ন্যায় গর্জিয়া উঠিল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। বিশ হাজার লোক এই সভায় সমবেত হইলেন—সভাপতি হইলেন কাশীমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ঘরের ভিতর লোক ধরিল না—সভার অংশ মাঠে সরাইয়া লইতে হইল। সঞ্জীবনী পত্রিকায় বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব বাহির হইল—টাউনহলের সেই বিরাট সভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জন প্রস্তাব গৃহীত হইল। দেশ গর্জন করিয়া বলিল—বিলাতী দ্রব্য আর স্পর্শ করিব না। যে আন্দোলনে পূর্বে আবেদন-নিবেদনের

সুর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, তাহা এখন গুরুগর্জনে দেশ মুখরিত করিয়া তুলিল,—রাজনৈতিক আন্দোলন অর্থনৈতিক আন্দোলনের গতিপথে প্রবাহিত হইল—দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির প্রচেষ্টা প্রবল বেগে চলিতে লাগিল—বিলাতী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" দিয়া অঙ্গাবরণ করিতে লাগিল, বিলাতী চুড়ির ভগ্ন অংশ সভাস্থলে স্তুপীকৃত হইতে লাগিল, সভায় সভায় বিলাতী বস্ত্র, বিলাতী জামাকাপড় অগ্নিদাহে ভস্মীভূত করা হইল, জড়িমাগ্রস্ত বাঙালীর দেহে যেন তড়িৎপ্রবাহ বহিতে লাগিল—বাঙালীর ইতিহাসে, বাঙালার জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ৭ই আগস্টের বিরাট সভার কর্ণধার ছিলেন। তাঁর সেদিনের কথা আজও আমরা ভুলি নাই। রাজকর্তৃপক্ষের হঠকারিতার তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী হইয়া যাইব। আমি এই পরিণামকে ভয় করি, ইহার সম্ভাবনা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ শত শতাব্দীর স্নেহবন্ধন টুটিয়া দিবে, সত্তার গভীর, নিবিড় সংগতি অভেদ সম্বন্ধ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে; আর আমার আশঙ্কা, রাজকর্তৃপক্ষের প্রতি দেশের যে সহানুভূতি তাহাও নির্মূল করিবে। এই অবস্থায় কি ইহাতে শাসনকার্যে কিছু মাত্র সৌকর্য হওয়া সম্ভব? ব্রিটিশ শাসনের সহিত চিরসম্পৃক্ত এক রাজবংশের প্রতিভূ-স্বরূপ হইয়া গভীর দায়িত্বজ্ঞান

লইয়াই আমাকে বলিতে হইতেছে—বঙ্গভঙ্গ নীতির ফলে অতি গর্হিততম রাষ্ট্রনীতিক ভুল করা হইল। আমার ইচ্ছা, কর্তৃপক্ষ ইহা বুঝিয়া এই বিষয়ে পুনরালোচনা করিয়া এই সঙ্কল্প প্রত্যাহার করুন।”

কিন্তু লর্ড কার্জন যে উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ নীতি আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা ছাড়িবার নহে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাংলার মজ্জাগত শক্তির সন্ধান পাইয়াছিল, তিনি বাঙালী জাতিকেই সাম্রাজ্য রক্ষার দিক হইতে অন্তরায় স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি চাহিয়াছিলেন—

১। বাঙ্গালী জাতির সমবেত শক্তি নষ্ট করিতে।

২। কলিকাতায় যে রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার মূলোৎপাটন করিতে।

৩। পূর্ববঙ্গে মুসলমান শক্তি পরিপুষ্ট করিয়া শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের দ্রুতবর্ধনশীল শক্তিকে বাধা প্রদান করিতে। মুসলমান প্রভাব পূর্ববঙ্গে বৃদ্ধি হইলে হিন্দু শক্তি স্বভাবতই নত হইবে, এই আশা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

ইংরেজ শাসনের মূল নীতিই ছিল—‘Divide and Rule’.

লর্ড কার্জন স্বীয় প্রস্তাব বাংলার জমিদারমণ্ডলী কর্তৃক সমর্থিত করাইয়া লওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন কেহ আত্মস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে নাই। মহারাজ সূর্যকান্তের নিকট লর্ড কার্জন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বঙ্গভঙ্গ

নীতি সমর্থন করার অনুরোধ করেন। তিনি রাজ-প্রতিনিধির এই অসঙ্গত প্রস্তাব মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বাঙালীর এতখানি স্পর্দ্ধা দেখিয়া লর্ড কার্জন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুর্জয় সঙ্কল্প কোন কারণে ভঙ্গ হইবার নহে, তিনি বাংলার রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র নারী-পুরুষ সকলের বিরুদ্ধ মত হইলেও বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন।

১৯০৫ সালের (খৃস্টাব্দের) ১লা সেপ্টেম্বর রাজপ্রতিনিধি ঘোষণা করিলেন যে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ অবধারিত সম্পন্ন হইবে। ক্রুদ্ধ বাঙালী পাল্টা জবাব দিয়া বলিল ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) হইতে আমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হইল। সারা বঙ্গের নেতৃবৃন্দের উৎসাহে সারা বঙ্গ ব্যাপিয়া "রাখী-বন্ধন"-এর মিলনোৎসব সম্পন্ন হইল। সে উৎসবে কেহ রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বালাইলেন না, দুগ্ধপান ও ফলাহার করিয়া সমস্ত দিন ভগবানের নিকট দেশের কল্যাণ কামনা করিলেন—আর গঙ্গাস্নান করিয়া মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে করিতে পরস্পরের মণিবন্ধে রাখীবন্ধন করিয়া রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন,—

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান্!
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান!
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্!
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্!

বিলাতের পার্লামেণ্ট সভায় লর্ড মর্লে প্রকাশ করিলেন "The partition of Bengal is a settled fact"। এই বাণী ভারতে পৌঁছিবামাত্র কলিকাতার জনসভায় দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্রনাথের বজ্রকণ্ঠে প্রত্যুত্তর প্রতিধ্বনি তুলিল—

"We will unsettle this settled fact"। এই অগ্নিমন্ত্রে সারা বাংলাদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বাংলার নগরে গ্রামে লর্ড মর্লের আদেশবাণী শ্রবণ মাত্র ছয় শত বিরাট সভায় বাংলার নরনারী মুক্তকণ্ঠে ইহা ব্যর্থ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। সেদিন কোথাও কোন মতভেদ ছিল না, বাংলার সমস্ত ধনকুবের ও জমিদারগণ একবাক্যে জাতীয় প্রতিবাদে যোগদান করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্যাকান্তের মতই পূর্ববঙ্গের জমিদারগণ, উত্তরবঙ্গের

জমিদারগণ শত প্রলোভন, শত ভ্রুভঙ্গ প্রদর্শনে সেদিন ভীত বা বিচলিত হন নাই, বাংলা সেদিন দেশপ্রেমের যথার্থ পরিচয় দিতে একবিন্দুও কুণ্ঠা বোধ করে নাই, তাই সে মহাযজ্ঞ সর্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে। তাই ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বয়ং সম্রাট্ ভারত-দর্শনের ছলে আসিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ঘোষণা করিলেন

"The partition is annulled"। এই রাজনৈতিক বিচ্ছেদের দিনে কলিকাতায় "জাতীয় ধনভাণ্ডার"-এর প্রতিষ্ঠা হইল, এবং মহানুভব আনন্দমোহন বসু রোগশয্যা হইতে আরাম কেদারায় বাহিত হইয়া পাশীবাগানে "মিলনমন্দির"-এর ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

রাজশক্তি আত্মমর্যাদা রক্ষায় রক্তচক্ষু হইল। ১৭ই অক্টোবর তারিখে কোন কোন স্কুলে ছাত্রগণ উপবাস করিয়া নগ্নপদে বিদ্যালয়ে গমন করিল—ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে, ও রংপুর স্কুলে এই অপরাধে বালকগণ দণ্ডিত হইল। ২২শে অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেণ্ট কার্লাইল সার্কুলার জারি করিলেন; তাহাতে স্কুলের ছাত্রগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ হইল। ইহার ফল কিন্তু শুভ হইল না। এই সার্কুলারের প্রতিবাদ স্বরূপে আণ্টি সার্কুলার সোসাইটি স্থাপিত হইল। স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘ গঠন, স্বদেশীদ্রব্য বিক্রয় ও রাজনীতি প্রচার হইল এই সমিতির মুখ্য কার্য। কেবল তাহাই নহে, ৯ই নবেম্বর তারিখে "ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবের" মাঠে

জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনকল্পে এক সভা হইল। ঐ সভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের সহায়তার জন্য একলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ১৯০৬ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্' স্থাপিত হইল। ময়মনসিংএর জমিদার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকা মূল্যের এক সম্পত্তি এই বিদ্যালয়ের জন্য দান করিলেন,ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষও বিস্তর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরিষদে কলা বিভাগ, গবেষণা বিভাগ শিল্প বিভাগ, কলেজ, পাঠশালা স্থাপিত হইল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এই সময়ে বরোদার রাজ কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের কার্য করিতেছিলেন ; বাংলায় নূতন প্রাণের পরিচয় পাইয়া তিনিও আসিয়া পরিষদের কার্যে যোগদান করিলেন। শ্রীবিনয়কুমার সরকার, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি প্রতিভাবান ছাত্র চারিদিক হইতে আসিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা আরম্ভ করিলেন। বাংলায় এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ১৯১।১নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং কিছুকাল পরে তাহা ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া যায়। এই দ্বিতীয় বাড়ী হইতে আবার স্বর্গীয় ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের বাড়ীতে (বর্তমানে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ রহিয়াছে—৯২নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ী) স্থানান্তরিত হয়।

বাঙালীর জীবনে যে নূতন শক্তি, নূতন প্রেরণা, নূতন উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কেবল স্বদেশী ও বয়কট নীতি অবলম্বন করিয়া বা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াই নিবৃত্ত রহিল না। এই আন্দোলনের ও আলোচনার মধ্যে যে নবীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের উৎসাহের পরিচয় চারিদিকেই প্রকাশিত হইতে লাগিল। বাংলাদেশে শিবাজী উৎসব ও ভবানী পূজার ধূম পড়িয়া গেল। সংবাদপত্র জগতে 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি নবোৎসাহে নূতন তেজে নূতন কথা শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীঅরবিন্দও ১৯০৭ সালের আগস্টমাসে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কার্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নবীন দলের মুখপত্র ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা "বন্দেমাতরম্"এর সম্পাদকীয় কার্যভার গ্রহণ করিলেন। কেবল তাহাই নহে রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব উপলক্ষে বিখ্যাত "শিবাজী" প্রশস্তি লিখিলেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ "প্রতাপাদিত্যে" মায়ের অপরূপ কল্পনা করিলেন, নাট্যশালায় জাতীয় নাটকের অভিনয় হইতে লাগিল, দেশে জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি হইল,—নূতন ও পুরাতন কবিগণ দেশাত্মবোধক গান, কবিতা ও ছড়া রচনা করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্" গানে সমস্ত দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল—নবীন দলের নবীন উৎসাহের পরিচয় নবীন বঙ্গে নব নব কার্যে নবীন মূর্তিতে প্রকট হইয়া উঠিল। এদিকে পূর্ববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশীবর্জন সঙ্কল্প বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল। স্বর্গীয়

অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে যুবকগণের চেষ্টায় বরিশাল হইতে বিলাতী লবণ নির্বাসিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। নূতন পূর্ববঙ্গে স্যার ব্যাম্‌ফিল্‌ড ফুলারের শাসনও অপ্রতিহত তেজে চলিতেছিল ও নিত্য নূতন অত্যাচারের পন্থা অবলম্বন করিতেছিল।

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল, ১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ বরিশালে এক কাণ্ডের অভিনয় হইল। এই ১৬ই এপ্রিল গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন স্থির হইল। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন সাহেবের আদেশে বরিশালে প্রকাশ্যস্থলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ হইল এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ প্রকাশ্যস্থলে "বন্দেমাতরম্" বলিবেন না—এই অঙ্গীকার করিয়া প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কলিকাতা হইতে অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ ও প্রতিনিধিগণ আসিয়া অভ্যর্থনা সমিতির এই হীন সর্তের সংবাদ পাইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—তাঁহারা তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না ও সর্বত্র মাতৃনাম শুনাইতে লাগিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশ মানিতে সম্মত ছিলেন না। যাহা হউক, সভাপতি আব্দুল রসুলকে লইয়া সভায় যাইবার পথে শোভাযাত্রার পশ্চাৎ ভাগ হইতে সোসাইটির যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের উপরে পুলিশ আক্রমণ করিল—অমনি চারিদিক হইতে মাতৃনাম উচ্চারিত

হইতে লাগিল। যতই "বন্দেমাতরম্" উচ্চস্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল, পুলিশের প্রহারও ততই বেগে চলিতে লাগিল—এমন কি পুলিশ সাহেব কেম্পও এই প্রহারে যোগ দিয়াছিলেন।

এই প্রহারে যুবকগণের অনেকেই আহত হইলেন। স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা বিশেষভাবে আহত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের তখন বঙ্গে অমিত প্রভাব; পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল—এমার্সন সাহেবের কোর্টে সুরেন্দ্রনাথের বিচার হইল। কোর্টে সুরেন্দ্রনাথ লাঞ্ছিত হইলেন ও চারিশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন—দেশে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

পূর্ববঙ্গের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস এখানেই শেষ হইল না। অনতিবিলম্বেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল; কুমিল্লার মুসলমানগণ হিন্দুপল্লী আক্রমণ করিল, পাবনায় হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে বিষম বিবাদ বাধিয়া উঠিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার ঘটিল ময়মনসিংএর অন্তর্গত জামালপুরে। মুসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া স্বদেশী দ্রব্যের দোকান লুণ্ঠন করিল। বাসন্তী প্রতিমা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। হিন্দু মহিলাগণ ভীত হইয়া দয়াময়ীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—কোন কোন রমণী পুষ্করিণীর জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন।

পূর্ববঙ্গে যখন এই অশান্তি ও উপদ্রব চলিতেছিল পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক আকাশও তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া

উঠিয়াছিল। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে হইতে প্রায় দুই বৎসর যাবৎ শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ বঙ্গদেশের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া স্বাধীনতা মন্ত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং শারীরিক শক্তির বৃদ্ধি ও রাজনীতির গতি লক্ষ্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে আখড়া স্থাপন করিতে লাগিলেন। ইহার পরে বারীন্দ্র কিছু দিনের জন্য বরোদায় তাঁহার ভ্রাতা অরবিন্দের নিকট গমন করেন। অরবিন্দ এই সময়ে বরোদা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গচ্ছেদ হইলে দেশে যখন তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল এবং স্বদেশী প্রচার ও বিদেশী বর্জনে দেশ যখন কৃতসংকল্প হইয়াছিল, সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া বারীন্দ্রও বঙ্গদেশে আগমন করিয়া গোপনে দেশের মধ্যে মুক্তি-বার্তা শুনাইতে লাগিলেন এবং দেশের নামে উত্তেজিত করিয়া কতকগুলি কোমল হৃদয় যুবক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিলেন, ও আবশ্যক হইলে দেশের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিবে তাহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করাইলেন।

বঙ্গভঙ্গের 'পর হইতেই সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই উত্তেজনার ফলেই দেশে নব জাগরণের সূত্রপাত। সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই নব জাগরণের চিহ্ন এই সময় প্রকট হইয়া উঠিল। যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি নূতন নূতন সাময়িক পত্র এই সময়ে স্বদেশে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সকল পত্রে যে

সমস্ত তেজোগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল, তাহাতে সমগ্র দেশ বুঝিতে পারিল কার্জনী শাসনে বাংলার প্রাণে নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্র উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় বিপ্লববাদ প্রচার করিতেছিল বলিয়া যুগান্তর ও সন্ধ্যার বিরুদ্ধে পুনঃপুন রাজদ্রোহের মোকদ্দমা চলিল। ১৯০৭ সালের ১৭ই জুলাই 'যুগান্তর' সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। ১৬ই আগস্ট 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদক বলিয়া অরবিন্দের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল।

প্রধানত সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অর্থ সাহায্যে 'বন্দেমাতরম' নামে একখানি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা এই সময়ে বাহির হইয়াছিল। ইহা যুবক সমাজের মুখপত্ররূপে কপালে 'India for Indians' এই জয়পত্র বাঁধিয়া প্রদীপ্ততেজে প্রকাশিত হইল। এই পত্রের কর্ণধার হইলেন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ কিন্তু তখনও পর্যন্ত বঙ্গদেশে অপরিচিত। অরবিন্দের পিতার নাম ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ (কৃষ্ণধন ঘোষ)। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম সংস্কারক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দৌহিত্র। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট কলিকাতায় ইহার জন্ম হয়। ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ ইংরেজি আদর্শে শিক্ষিত করিবার জন্য পুত্রগণকে বিলাতে প্রেরণ করেন। অরবিন্দ লণ্ডন নগরে সেণ্টপলস স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া পরে ১৮৯০ খৃস্টাব্দে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় দশম স্থান

অধিকার করেন। কিন্তু অশ্বারোহণে অপটুতাবশতঃ ইনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ইনি কেম্ব্রিজে বৃত্তিলাভ করিয়া কিংস্ কলেজ হইতে ক্লাসিকাল ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ সালে বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড়ের ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অরবিন্দ তাঁহার সহিত পরিচিত হন ও তাঁহার অনুরোধে মাসিক ৭৫০৲ বেতনে বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। ইহার পর ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অরবিন্দ উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। বাল্যাবধি বিলাতে প্রবাস হেতু তিনি আদৌ বাংলা বলিতে পারিতেন না।

একটি সম্পাদক সঙ্ঘদ্বারা 'বন্দেমাতরম্' পত্র সম্পাদিত হইত। অরবিন্দ ছিলেন ইহার প্রধান সম্পাদক এবং শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতিও ইহার সম্পাদক সঙ্ঘের অন্তর্ভূত ছিলেন। ইহার তেজপূর্ণ রচনায় অনতিবিলম্বেই ইহা গবর্ণমেণ্টের বিরাগ ভাজন হইয়া উঠিল এবং ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে লিখিত 'Politics for Indians' নামক প্রবন্ধ এবং ২৮শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত (Jugantar case) 'যুগান্তর' মোকদ্দমা শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। এখন যেমন প্রত্যেক কাগজই সম্পাদকের নাম

মুদ্রিত করিতে বাধা, তখন এ নিয়ম ছিল না। সুতরাং অরবিন্দ যে এই পত্রের সম্পাদক ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষীরূপে আহ্বান করা হইল।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তারিখে বিপিনচন্দ্র আদালতে উপস্থিত হইলে এবং তাঁহাকে আদালতের প্রথামত শপথ করিতে বলা হইলে, তিনি উত্তর করিলেন 'এই মোকদ্দমায় সাহায্য করিতে ও শপথ গ্রহণ করিতে বিবেকানুযায়ী আমার আপত্তি আছে।'

He (Mr. B.C. Paul) said : I have conscientious objections to swear or take any part in these proceedings.

The Court : Have you conscientious objections to be solemnly affirmed ?

Mr. B.C. Paul : I decline to take part in these proceedings, because I consider it—

The Court : I have nothing to do with that. Have you conscientious objections to be affirmed in any other case ?

Mr. B.C. Paul - No ; But I have conscientious objections to take part in this case.

The Court : You must take it in this case then.

Mr. B.C. Paul : I decline to do that.

The Court : Questions will be put to you and if you refuse to answer; then you must take the consequences.

Mr. B. C. Paul : On conscientious grounds I must refuse.

Mr. Gregory : Have you been subpoenaed to give evidence in this case ?

Mr. B. C. Paul : Yes.

Mr. Gregory : Do you know a paper called "Bande Mataram" ?

Mr. B. C. Paul : I have already told your Honour that I decline to take part in these proceedings. I decline to answer any question in connection with the prosecution of this paper as it is wholly unjustified and—

The Court : I decline to hear you on that point.

Mr. B.C. Paul : I decline to answer any question.

Mr. Gregory : There is a question which your Honour might put.

Mr. B. C. Paul : I decline to answer any question in connection with this case.

The Court : Mr. Gregory, what course do you suggest ?

Mr. Gregory : Will your Honour kindly leave this matter open for a short time for reflection ?

The Court . Of course, I can leave it open temporarily, but I am very loath to do so. (To Bepin Babu) Surely you can answer the question put to you ?

Mr. B. C. Paul : Since prosecution was started I honestly believed that it was unjust and injurious to the cause of popular freedom.

The Court : You have made up your mind, you decline to reconsider the matter.

Mr. B. C. Paul : Yes in the interests of public I decline to answer.

The Court : If you don't answer the question put

you must take the consequences. You will have to give your personal recognisance of Rs. 50/- to come here to-morrow, when I will tell you what I intend to do.

কোর্ট—আপনার কি শপথ করিতেও বিবেকানুযায়ী আপত্তি আছে ?

. মিঃ বি, সি, পাল—আমি এই মোকদ্দমায় সাহায্য করিতে অস্বীকৃত, কারণ আমি মনে করি,—

কোর্ট—আমি ইহা শুনিতে চাই না। আপনার কি অন্য কোন মোকদ্দমায় শপথ করিতে আপত্তি আছে ?

মিঃ বি, সি, পাল—না। কিন্তু এই মোকদ্দমায় সাহায্য করিতে আমার বিবেকানুযায়ী আপত্তি আছে।

কোর্ট—তাহা হইলে আপনাকে এই মোকদ্দমায়ও শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

মিঃ বি, সি, পাল—আমি তাহা করিতে অস্বীকার করিতেছি।

কোর্ট—আপনাকে প্রশ্ন করা হইবে, যদি আপনি উত্তর দিতে অস্বীকার করেন তবে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

মিঃ বি, সি, পাল—বিবেকধর্ম হিসাবে আমি অস্বীকার করিব।

মিঃ গ্রেগরী—আপনি এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য সমন পাইয়াছেন ?

মিঃ বি, সি, পাল—পাইয়াছি।

মিঃ গ্রেগরী—আপনি 'বন্দেমাতরম্' নামে একখানি কাগজ জানেন ?

মিঃ বি, সি, পাল—আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে এই মোকদ্দমায় কোনরূপ সাহায্য করিতে আমি অস্বীকৃত। এই কাগজের মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কারণ ইহা সম্পূর্ণ অন্যায়-মূলক ও—

কোর্ট—ও সম্বন্ধে কোন কথা আমি শুনিতে চাহি না।

মিঃ বি, সি, পাল,—কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি চাহি না।

মিঃ গ্রেগরী—(কোর্টের প্রতি) আপনি একটি প্রশ্ন করতে পারেন।

মিঃ বি, সি, পাল—এই মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন প্রশ্নেরই আমি উত্তর দিব না।

কোর্ট—মিঃ গ্রেগরী, কি করা যাইবে ?

মিঃ গ্রেগরি—বিবেচনার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিতে পারেন না কি ?

কোর্ট—অবশ্য পারি, কিন্তু এরূপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। (বিপিন বাবুর প্রতি) আপনাকে যে প্রশ্ন করা হইল, নিশ্চয়ই আপনি তাহার উত্তর করিতে পারেন ?

মিঃ বি, সি, পাল—এই মোকদ্দমার সৃষ্টি অবধি আমার বদ্ধ ধারণা হইয়াছে যে ইহা অন্যায় ও সাধারণের স্বাধীনতার পরিপন্থী।

কোর্ট—আপনি তাহা হইলে স্থির সিদ্ধান্তই করিয়াছেন—আপনি ইহা আর পুনর্বিবেচনা করিবেন না।

মিঃ বি, সি, পাল—হাঁ। সাধারণের স্বার্থের জন্য আমি কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করিতেছি।

কোর্ট—যদি আপনাকে প্রশ্ন করিলে উত্তর না দেন, তবে আপনাকে ফলভোগ করিতে হইবে। আগামী কল্য এই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য আপনাকে ৫০৲ টাকার স্বকীয় জামিন দিতে হইবে। আমি কি করিব তাহা আপনাকে কল্য বলিব।

ইহার পরে বিপিনচন্দ্র কোর্ট পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক ২৯শে আগস্ট (১৯০৭) তারিখে আদালত অবমাননার অপরাধে বিপিনচন্দ্র অভিযুক্ত হইলেন এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আর, এন্, সিংহ মহোদয়ের কোর্টে বিচার হইল। চিত্তরঞ্জন বিপিনচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিলেন।

১৯০৭ সালের ১০ই সেপ্টম্বর তারিখে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল। সাক্ষ্যদিতে অস্বীকৃত হওয়ায় আদালত অবমাননার জন্য বিপিনচন্দ্রের ৬ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইল। এই মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাশক্তি, আইন জ্ঞান ও কূটতর্কের পরিচয় পাইয়া সকলেই একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিংসফোর্ডের এজলাসে বিপিনচন্দ্রের বিচার দেখিতে যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ১৫ বৎসরের কিশোর বালক সুশীল সেনও ছিল। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ ইনেস্পেক্টর মিঃ হিউ হঠাৎ ক্ষেপিয়া গিয়া ঐ কিশোরের উপরে বেটন ও ঘুষি

চালাইল। বালক সুশীল সেনও মুষ্ট্যাঘাতে অত্যাচারের জবাব দিল। কসাই কাজী কিংসফোর্ড ক্ষেপিয়া উঠিল। কালা আদমীর এত সাহস। হুকুম দিল চালাও বেত ঐ বালকের সর্বাঙ্গে। জনতা বিস্মিত। বেত্রাঘাতে জর্জরিত বালক নীরবে শান্ত ভাবে সকল অত্যাচার সহ্য করিল!

অরবিন্দ ২৩শে সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে "বন্দেমাতরম্" পত্রের মধ্য দিয়া অরবিন্দ যেমন তাঁহার New Spirit শীর্ষক প্রবন্ধের সাহায্যে নবভাব জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে জাতীয়তার উন্মেষ সাধন করিতেছিলেন, "সন্ধ্যা" পত্রিকায়ও সেইরূপ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রচলিত বাংলায় ঠাট্টা বিদ্রূপ ও রহস্যের ভিতর দিয়া লোকের ভয় ভাঙ্গাইয়া দিতেছিলেন। সুতরাং অচিরেই ব্রহ্মবান্ধব গবর্ণমেণ্টের বিষ-নয়নে পড়িলেন।

১৮৬১ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় ব্রহ্মবান্ধব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ, ইঁহার বাল্যনাম ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে ইনি মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন; পরে কতিপয় রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীর সহিত মিলিত হইয়া খৃস্টধর্মে অনুরাগী হন ও খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এই সময়ে তিনি ভবানীচরণ নাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। ইনি সিন্ধুদেশে "কঙ্কর্ড" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার পরে কলিকাতায়

Twentieth Century নামে একখানি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। পরে বিলাতে গিয়া বেদান্তের প্রচারকল্পে অক্সফোর্ড শহরে হিন্দু দর্শন ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার ফলে অক্সফোর্ডে বেদান্ত অধ্যাপনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অতঃপর ইউরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণ পূর্বক কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন ও সেই সময় হইতে আবার ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া পরিচিত হন। আত্মপরিচয়ে "স্বরাজ"পত্রে তিনি গল্পচ্ছলে লিখিয়াছিলেন… "বিদ্যাসাগরের কলেজে এফ্-এ ক্লাশে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি।…আমার মন কেমন উধাও। সুরেন বাঁড়ুজ্জ্যের লেক্চার শুনিয়া, দেশের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছি—নিজের ভাবনা ছাড়িয়া পরের ভাবনা বড়ই মিষ্ট লাগে। সুরেন বাঁড়ুজ্জ্য তাঁহার লেক্চারে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের মধ্যে ম্যাট্সিনী, গারীবল্ডী কে হবে? আমরা উৎসাহে হাততালি দিয়া বলিতাম all, all। মনে মনে স্থির করিলাম বিবাহ করিব না—বি-এ. এম্-এ পাস করিব না, প্রাণপণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিব।

"আমার ঘর নাই—পুত্র-কলত্র কেহই নাই—আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া, সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে এ কি কথা শুনিলাম! কত চেস্টা করিলাম কথাটী ভুলিয়া যাইতে, কিন্তু যত ভুলিতে চাই, ততই ঐ কথাটী প্রাণে

প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল। কথাটা কি? ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জন ধ্যান-ধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে। নির্জন দেশ হইতে সজনে আসিলাম—আসিয়া দেখি যে আমার মত দু' চারিজন ভবঘুরে লোক ঐ দেববাণী শুনিয়াছে। বিস্ময়ের কথা, এত বড় বড় লোক থাকিতে আমার ন্যায় ধনজনবিহীন গরীবেরাই এ খেয়ালে মজিল কেন? জানি না, ভগবানের কি উদ্দেশ্য। আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি ···"। এই মুক্তি প্রেরণায় চির-উন্মাদ ব্রহ্মবান্ধব স্বদেশ-সেবায় ব্রতী হইয়া স্বদেশ-মন্ত্রের সাধকরূপে বঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন সময়ে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে সন্ধ্যা নামে একখানি দৈনিক পত্রের প্রচার করেন।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের ৩০শে আগস্ট তারিখে "সন্ধ্যা" আপিসে পুলিস পড়িল—সঙ্গে তিনখানি ওয়ারেণ্ট। কিন্তু ম্যানেজার সারদাচরণ সেন ব্যতীত সেদিন আর কাহারও উদ্দেশ মিলিল না। ৩রা আগস্ট, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা-সম্পাদক জোড়াসাঁকো থানায় চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, পুলিস সন্ধ্যা আপিসে আসিলে তিনি ধরা দিতে প্রস্তুত আছেন। তদনুসারে ইন্‌সপেক্টর লাহিড়ী ও গুপ্ত সন্ধ্যা আপিসে আসিয়া সম্পাদক উপাধ্যায় ও প্রিন্টার হরিচরণ দাসকে বন্দী করিয়া থানায় লইয়া গেলেন, কিন্তু সেই দিনই দশ সহস্র মুদ্রার জামিনে দুইজনই মুক্ত হইলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ কিংসফোর্ড সাহেবের নিকট সন্ধ্যা-মামলার বিচার আরম্ভ হইল। কিন্তু ১৭ই সেপ্টেঃ তারিখে চিত্তরঞ্জন সন্ধ্যার পক্ষে কিংসফোর্ডের নিকট হইতে অন্য কোর্টে মোকদ্দমা স্থানান্তরিত করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিলেন। আবেদন পত্রে লিখিত হইল "এই সন্ধ্যাপত্রে অর্দ্ধরাজনৈতিক আখ্যাপ্রাপ্ত কয়েকটি সাম্প্রতিক মোকদ্দমায় মিঃ কিংসফোর্ডের বিচার প্রণালী ও ব্যবহার সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা হইয়াছে, সুতরাং সেই কোর্টে এই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত নহে।"

এই উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনের সহিত জজ মিঃ ক্যাস্‌পার্সের নিম্নলিখিতরূপে বাদানুবাদ হইয়াছিল—

J. Caspertz : What do you mean by political character ? In this country "Political" means "Foreign". The political department is a foreign department.

Mr. Das : I do not suppose it has that sense. It means a matter of contest between the govt. and the people.

J. Caspertz : I don't think that is the meaning in any country in the world.

Mr. Das : I don't think in any other country in the world the same circumstances are present.

জজ—"রাজনৈতিক" অর্থে আপনি কি বলিতেছেন? এদেশে "রাজনৈতিক" অর্থে "বৈদেশিক";—রাজনৈতিক বিভাগ,—বৈদেশিক বিভাগ।

মিঃ দাশ—আমি ইহার এইরূপ অর্থ মনে করি না। ইহা গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের বিরোধ।

জজ—আমার মনে হয় না পৃথিবীর কোথাও এইরূপ অর্থে ইহা প্রযুক্ত হয়।

মিঃ দাশ—আমারও মনে হয় না পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও এইরূপ অবস্থা বর্তমান আছে।

যাহা হউক হাইকোর্টের বিচারে এই আবেদন অগ্রাহ্য হইল। সুতরাং ২৩শে সেপ্টেম্বর (১৯০৭) তারিখে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের কোর্টে সন্ধ্যা মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

মোকদ্দমার দিন চিত্তরঞ্জন এটর্নী আপিসে বসিয়া আছেন, উপাধ্যায় আসিতেছেন না, তাঁহার মোকদ্দমার সময় হইয়া আসিল,—চিত্তরঞ্জন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় উপাধ্যায় ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, আমি ইংরাজের কোর্টের বিচার মানি না,—আমি আমার জবাব লিখিয়া আনিয়াছি। আগ্রহ সহকারে চিত্তরঞ্জন উপাধ্যায়ের বক্তব্য পড়িতে লাগিলেন, উপস্থিত ব্যারিস্টারগণ উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। উপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "সন্ধ্যা কাগজের প্রকাশকের, সম্পাদকের ও কার্যাধ্যক্ষের সমস্ত দায়িত্ব আমার, এবং আমি স্বীকার করিতেছি যে ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তারিখে সন্ধ্যায় প্রকাশিত "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক আমিই। কিন্তু আমি এই বিচার মানি না। কারণ, বিধিনির্দিষ্ট স্বরাজ দাবী কার্যের আমি যেটুকু কার্য

করিয়াছি তাহার জন্য আমি—যে বিদেশীরা ঘটনাক্রমে আমাদের শাসনকর্তা হইয়াছে এবং আমাদের যথার্থ জাতীয় উন্নতি যাহাদের স্বার্থের বিরোধী—সেই বিদেশীর নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহি।

I accept the entire responsibility of the publication, management, and conduct of the newspaper Sandhya and I say that I am the writer of the article "Ekhan theke gechi premer dai" which appeared in the Sandhya of the 13th Aug. 1907, being one of the articles forming the subject matter of this prosecution. But I do not want to take part in this trial, because, I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national developement.

উপাধ্যায়ের এই বর্ণনাপত্র পড়িয়া চিত্তরঞ্জন আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেখুন শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারবেন ত? আপনি ঠিক থাকলে আমরা ঠিক আছি।" অচল অটল উপাধ্যায় বলিলেন "আমি কখনও দুই কথা বলি না, ইংরাজের বিচার আমি মানি না" সত্যই উপাধ্যায়কে ইংরাজের বিচার মানিতে হয় নাই, সত্যই তাঁহার গর্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

ব্রহ্মবান্ধবের এই জবাব পড়িয়া বিজ্ঞ ব্যারিস্টারগণ পেণ্ডুলামের মত ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। বিজ্ঞতম জাক্‌সন্ বলিলেন,

এ জবাব লইয়া আদালতে হাজির হওয়া নিতান্ত বাতুলতা ও দুঃসাহসিকতা। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এরূপ সাহস দেখাইবার মত বাঙালী যে এখনও একজনও আছেন এই উল্লাসে তিনি আত্মহারা।

কোর্টে উপাধ্যায় নিজহস্তে বর্ণনাপত্র দাখিল করিলেন। তখন চিত্তরঞ্জন বলিলেন, উপাধ্যায় ত বর্ণনাপত্র দাখিল করিলেন, সুতরাং আমি দ্বিতীয় আসামী সারদার পক্ষ সমর্থন করিব।

৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। সন্ধ্যায় ৭ই আগস্ট তারিখে প্রকাশিত—"আমাদের পোয়াবারো, ফিরিঙ্গির তেরো", ৯ই তারিখে প্রকাশিত "আজ কালীঘাটে জোড়াপাঁটা একটা কালো একটা সাদা," ৩০শে আগস্ট তারিখে প্রকাশিত "ঢেঁকি অবতার", ৩রা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত, "গোদা-পায়ের ভোঁতা লাথি" এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত "দুনো মজা, তিলে খাজা" রাজদ্রোহজনক বলিয়া এই মোকদ্দমার সৃষ্টি। চিত্তরঞ্জন সমস্ত দিন ধরিয়া প্রত্যহ জেরা করিতেন আর রাত্রে নিজ আবাসে ব্রহ্মবান্ধবের নিকট হইতে মোকদ্দমা সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। উপদেশ দিতে দিতে যেদিন বেশী রাত্রি হইয়া যাইত বা উপাধ্যায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, সেদিন আর তিনি বাড়ী যাইতেন না,—চিত্তরঞ্জনের বাটীতে মেঝের উপর শুইয়া পড়িতেন। চিত্তরঞ্জনের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বিছানায় শুইতেন না। ব্রহ্মবান্ধবের এই নিস্পৃহতা চিত্তরঞ্জন বিশেষ পছন্দ করিতেন।

এই সময় নিত্য নূতন রাজদ্রোহের মামলা হইত এবং প্রায় সর্বস্থলেই কিংস্‌ফোর্ড হইত বিচারক। কিন্তু এই সমস্ত মোকদ্দমায় কিংস্‌ফোর্ড সুনাম অর্জন করিতে পারে নাই। ৩রা অক্টোবর (১৯০৭) তারিখে কিংস্‌ফোর্ড টিফিনে গিয়াই অতি অল্প সময়েই চলিয়া আসিল। এই সংবাদ পাইয়া চিত্তরঞ্জনও বিস্মিত হইয়া অভুক্ত অবস্থায়ই চলিয়া আসিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। বেলা ৫টার সময় চিত্তরঞ্জন কোর্টকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এখন উঠিবেন না?"

Mr. Das : Does not your Honour propose to rise now ?

The Court : No, Mr. Das, I will be at you since till some time.

Mr. Das : I am sorry, I have been without food since 10 o'clock in the morning.

The Court : I think you must go on, Mr. Das.

Mr. Das : But then it is physically impossible Sir, I am feeling dizzy. I could not take anything during the half an hour, for which your Honour rose for lunch.

The Court : That is your look out, Mr. Das, you must go on.

Mr. Das : How can I go on ? Is not it absurd ?

The Court : It is absurd for counsel to talk about his food in the midst of a case. I can't hear all that I am not supposed to know, whether you took your food or not.

Mr. Das : May I know, how long your Honour would like to sit ?

The Court : I won't give you any indication. You must go on till I tell you to stop.

Mr. Das : Very well, then I will go on, so long I am physically able.

Mr. Das : (To Court) I have done with this witness so far as the articles shewing intention are concerned. I intend taking up the articles forming the subject matter of the charge to-morrow if your Honour will kindly allow me that.

The Court : I understand you to say that you would finish this witness to-day : I gave you two days' time.

Mr. Das : I did my best to expedite matters, witness would not answer questions. He made rambling statements.

The Court : I know nothing about that. How long would you be ? Can't you take him up now ?

Mr. Das : No, your Honour, I am sorry, I can't go on now with the case.

The Court : I refuse to allow any adjournment.

Mr. Das : I beg your Honour's leave to retire from the case.

The Court : Very well. (To second accused) Whom do you propose to cross-examine next ?

Accused No : 2 : I have got to engage another counsel.

The Court : (To Mr. Hume) I want to take up this case to-morrow at 10 o'clock in the morning. If the accused get his counsel ready, well & good, or I will dispose of the case at once.

কোর্ট :—না, মিঃ দাশ, আমি আরও কিছুক্ষণ আপনার সহিত কাজ করিব।

মিঃ দাশ ঃ—কিন্তু আমার শরীরে আর কুলাইতেছে না, আমার মাথা ঘুরিতেছে। আপনি টিফিনের সময় যে মাত্র আধ ঘণ্টা বাহিরে ছিলেন, তখন আমি কিছুই খাই নাই।

কোর্ট ঃ—সে আপনার ইচ্ছা, মিঃ দাশ, আপনার কাজ করুন।

মিঃ দাশ ঃ—কি করিয়া কাজ করিব? ইহা কি অসম্ভব নহে?

কোর্ট ঃ—একটা মোকদ্দমা করিতে করিতে তার মাঝখানে খাওয়ার কথা বলা একজন ব্যারিস্টারের পক্ষে অসঙ্গত। এসব আমি শুনিতে পারি না, আপনি খেয়েছেন কিনা তাহা জানিবার আমার কোনও দরকার নাই।

মিঃ দাশ ঃ—আপনি আর কতক্ষণ থাকিবেন জানিতে পারি কি?

কোর্ট ঃ—আমি সে সম্বন্ধে কিছুই বলিব না। আমি যতক্ষণ থামিতে না বলিব ততক্ষণ আপনাকে কাজ করিতে হইবে।

মিঃ দাশঃ—বেশ, আমি যতক্ষণ পারিব ততক্ষণ করিব।

চিত্তরঞ্জন পুনরায় জেরা আরম্ভ করিলেন। বেলা ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় তিনি পুনরায় বলিলেন, "প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রমাণ করিতে এ সাক্ষী সম্পর্কে আমার কার্য শেষ হইয়াছে। আপনার সম্মতি হইলে আগামী কল্য আমি প্রবন্ধগুলির অভিযোগের সহিত সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করিব।"

কোর্ট :—আমি আপনাকে দু'দিনের সময় দিয়াছিলাম, সুতরাং আপনি আজই এই জেরা শেষ করিবেন, ইহাই আপনার নিকট শুনিতে চাই।

মি: দাশ :—শীঘ্র শীঘ্র কার্য শেষ করিবার জন্য আমি যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সাক্ষী উত্তর দিতে পারে নাই,—সে এলোমেলো উত্তর দিয়াছিল।

কোর্ট :—আমি এসব কিছু জানি না। কতক্ষণ আপনি থাকিবেন ? আপনি এখনই আরম্ভ করিতে পারেন না কি ?

মিঃ দাশ :—আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই মোকদ্দমার কাজ এখন আমি করিতে পারিব না।

কোর্ট—আমি মোকদ্দমা আর বন্ধ রাখিতে পারিব না।

মিঃ দাশ—আমি তাহা হইলে এই মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কোর্টের অনুমতি চাহিতেছি। আত্মাভিমানী চিত্তরঞ্জন অবিলম্বে আদালতগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

কোর্ট—বেশ। (আসামীর প্রতি) ইহার পরে তুমি কাহাকে জেরা করিতে চাও ?

আসামী (২নং)—আমি অন্য একজন ব্যারিস্টার দিব।

কোর্ট—(সরকারী ব্যারিস্টার মিঃ হিউমের প্রতি) আমি আগামী কল্য বেলা ১০টার সময় মোকদ্দমা আরম্ভ করিব। আসামীর ব্যারিস্টার যদি উপস্থিত হন ভালই, নতুবা কালই আমি মোকদ্দমা শেষ করিব।

ইহার পরে মিঃ এচ্, ডি, বসু দ্বিতীয় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে আসিলেন। কিন্তু নূতন আসিয়া মোকদ্দমা সম্বন্ধে কিছুই জানিবার অবসর তখন পর্যন্তও তিনি পান নাই, সেই জন্য মোকদ্দমা মুলতুবী রহিল। ২৩শে অক্টোবর উপাধ্যায় পীড়িত বলিয়া আদালতে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, সংবাদ আসিল তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালে শয্যাশায়ী।

২৭শে অক্টোবর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্যাম্বেল হাসপাতাল হইতে সার্টিফিকেট পৌঁছাইল যে একমাসের মধ্যে তাঁহার আদালতে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু ঐ দিনই (২৭শে অক্টোবরের) বেলা ৯ ঘটিকার সময় ব্রহ্মবান্ধব সত্যসত্যই ব্রিটিশ শাসন অগ্রাহ্য করিলেন। ২১শে অক্টোবর হার্নিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ক্যাম্বেলে প্রবেশ করেন—তাঁহাকে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল, তাঁহার অবস্থা ভালই হইতেছিল—কিন্তু ২৬শে তারিখে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার কার্যাধ্যক্ষ সারদার নামে আবার রাজদ্রোহের জন্য সমন বাহির হইয়াছে,—সারদাকে অভুক্ত অবস্থায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহাকে জামিন দেওয়া হয় নাই। এই সারদা তাঁহার অতি প্রিয় বিশ্বাসী ভক্ত ছিল। উপাধ্যায় তাহার বৃদ্ধ পিতার নিকট হইতে তাহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। সারদার কারাপ্রবেশের কথা শুনিয়া উপাধ্যায় বলিতে লাগিলেন, "তাহার শাস্তি হইলে আমার দুঃখের সীমা থাকিবে না।" তাঁহার সর্বশরীর দিয়া যেন বিদ্যুৎ চলাচল করিতে

লাগিল। তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "আমি সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধেই লইয়াছি—তবুও ইহাকে লইয়া এত টানাটানি কেন?" ইহার পর হইতে তাহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল—পরদিন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ পাইয়া তাঁহার প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে মিলিত হইল। ধন্য ধন্য উপাধ্যায়! এ বুঝি তোমার ইচ্ছামৃত্যু—মৃত্যুবরণ করিয়া তুমি তোমার গর্ব সফল করিলে—মৃত্যুতে তুমি আরও উজ্জ্বল হইলে—এ বুঝি তোমার মৃত্যু নহে, এ তোমার বিজয়! ১৯০৭ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গোয়েন্দা বিভাগ বাঙালী বিদ্রোহীদলের অস্তিত্বের সন্ধান পাইল। কিন্তু ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানিতে পারিল না।

ছোটলাট সার এনড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন ধ্বংস করিয়া দেওয়ার চেষ্টা বিপ্লবীদল দুইবার করিয়াছিল। ১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে চন্দননগরে প্রথম সে চেষ্টা হয়। শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকার এই কাজের জন্য চন্দননগর যান। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। ইহার পর নারায়ণগড়ে ছোটলাটের ট্রেন উড়াইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা হয়। সে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরের কথা। স্থান নির্বাচনের জন্য প্রথমে হরিশ ঘোষ ও শান্তি ঘোষকে পাঠান হয়। কিন্তু তাঁহারা ভালভাবে স্থান নির্বাচন করিতে পারেন নাই বলিয়া পরে প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকারকে পাঠান হইল। ৬ই ডিসেম্বর রাত্রিতে নারায়ণগড় ও বেনাপুর স্টেশনের মধ্যে ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের

চেষ্টা হইলে গোয়েন্দা বিভাগ এই সম্প্রদায়ের গতিবিধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং মুরারিপুকুর বাগান, কলিকাতার অন্যান্য আড্ডা ও নবশক্তি পত্রিকার কার্যালয়ে গুপ্ত পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইল। ১৯০৭ সালের শেষভাগে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেবের উপর গুলি চলিল। ইহার পরে কুষ্টিয়ার পাদরি হিকের বোথামের উপর গুলি চলিল। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখ চন্দননগরে রাজনীতিসংক্রান্ত মিটিং বন্ধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য চন্দননগরের মেয়রের বাটীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল এবং ২০শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্সি মাজিস্ট্রেটরূপে কয়েকটি রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় শাস্তি দেওয়ার জন্য মজঃফরপুরের তদানীন্তন সেসন্স্ জজ কিংসফোর্ড সাহেবকে চরম পত্র প্রেরিত হইল। গুপ্ত সমিতি হইতে মজঃফরপুর যাইয়া কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট হন। এই কাজের জন্য ৩০০৲ টাকা প্রয়োজন বলিয়া উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে (ওরফে গোবিনদা') জানান হয়। তিনি মিছরি বাবুর (হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার খ্যাতমামা জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) নিকট হইতে ঐ টাকা লইয়া 'নবশক্তি' আফিসে দিয়া আসেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কিংসফোর্ডের হত্যার উদ্দেশ্যে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু বোমা ও পিস্তলসহ মজঃফরপুর রওনা হন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রফুল্ল চাকী

জন্ম—বাল্য—কৈশোর

বগুড়া হইতে কলিকাতার দূরত্ব ১৯৯ মাইল। জেলার সদর শহর বগুড়া করতোয়া নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত। বগুড়া আধুনিক শহর, ইহা ইংরেজগণ কর্তৃক ১৮২১ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন হইতেই জেলার সদর শহর। বগুড়ার নবাববাটীই এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। বগুড়ার ফৌজদারী কাছারীর নিকট শহরের বিভিন্ন অংশ হইতে সাতটি রাস্তা আসিয়া একত্রে মিলিত হইয়াছে। এই স্থানকে "সাতসড়ক" বলে। বগুড়ার প্রায় সমুদায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সাতসড়কের নিকট অবস্থিত। বগুড়া শহরে একটি ধর্মশালা ও কয়েকটি হোটেল আছে। বালক বালিকাদিগের জন্য কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এখানে আছে।

বগুড়ার প্রান্তবাহিনী করতোয়া নদী এককালে প্রবল স্রোতা ছিল এবং প্রাচীন বরেন্দ্র ও কামরূপ রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিত। পূর্বে এই নদীর খাদ দিয়াই তিস্তার জলরাশি পদ্মায় গিয়া পড়িত। ১৭৬৭ খৃস্টাব্দের ভীষণ বন্যায় তিস্তা

গতি পরিবর্তন করিয়া পূর্বদিক দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হয়। এই বিপর্যয়ের পর হইতে করতোয়ার অবনতি আরম্ভ হয়। অমরকোষে ইহার অপর নাম সদানীরা বলা হইয়াছে এবং গঙ্গা যমুনার ন্যায় এই নদীও পুণ্যতোয়া বলিয়া গণ্য। স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ, ও যোগিনীতন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামে স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। করতোয়ার অপর নাম সদানীরা নামে একটি নদীর উল্লেখ বেদের অনুগামী শতপথ ব্রাহ্মণেও দৃষ্ট হয়। স্কন্দপুরাণে করতোয়াকে "পৌণ্ড্রগণের প্লাবনকারিণী" বলা হইয়াছে। তাহাতে আরও বর্ণিত আছে যে হর-গৌরীর বিবাহকালে গিরিরাজ হিমালয়ের করভ্রষ্ট মন্ত্রপূত জল হইতে এই নদীর উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম "করতোয়া।" স্কন্দপুরাণের মতে বর্ষাকালে অপর সকল নদনদীই মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পাবনীশক্তি আর থাকে না; সেই সময়ে একমাত্র করতোয়াই বিশুদ্ধ সলিল বহন করে এবং তাহার পবিত্রতা অক্ষুন্ন থাকে। পঞ্জিকাগুলিতে গঙ্গাস্নানের ন্যায় করতোয়া স্নানেরও বিভিন্ন যোগ উল্লিখিত থাকে। মহাভারতের বন-পর্বে লিখিত আছে যে করতোয়া স্নান করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্রখণ্ড অনুসারে পৌষনারায়ণীযোগে বারাণসীতে পূজা করিলে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার লাভ করে কিন্তু করতোয়া জলে পূজা করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়। করতোয়ার

শীলা দ্বীপে স্নান করিলে আবার সর্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যসঞ্চয় হয়।

বগুড়ার নিকটবর্তি বৃন্দাবনপাড়া নামক গ্রামে ক্ষৌণীনায়ক ভীমের জাঙ্গালের কিয়দংশ বিদ্যমান আছে। বগুড়া হইতে মহাস্থানের পথে স্থানে স্থানে এই জাঙ্গাল বা প্রাচীরের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ভীমের জাঙ্গাল বগুড়া শহরের উত্তরপূর্ব হইতে বৃন্দাবনপাড়া, মহাস্থানগড়, চাঁদমুয়া, কীচক, শালদহ প্রভৃতি হইয়া ঘোড়াঘাট পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। লালমাটির এই জাঙ্গালটি স্থানে স্থানে এখনও ২০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। এই জাঙ্গাল-বেষ্টিত স্থান ক্ষৌণীনায়ক ভীম প্রতিষ্ঠিত মহাস্থানের উপপুর ছিল বলিয়া কথিত। হাণ্টার সাহেব ইহাকে ইতালীয় রিংফোর্ট বা অঙ্গুরীয়ক দুর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিপদের সময়ে নিকটস্থ জনপদের প্রজাগণ কিছুদিনের জন্য ইহার মধ্যে আশ্রয় লইতে পারিত।

বগুড়া হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে মাঝিড়াগ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পণ্ডিতসা নামক একজন বিখ্যাত দস্যুর আড্ডা ছিল। তাহার অত্যাচারে জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। বগুড়ার উত্তরে কালীতলাহাট গ্রামেও তাহার একটি আড্ডা ছিল। এই দুই গ্রামে কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা পণ্ডিত সা কর্তৃক প্রবর্তিত হয়।

বগুড়া হইতে ছয় মাইল উত্তরে করতোয়ার নিকট লাহিড়ী-পাড়াগ্রামে “বিষহরি পদ্মপুরাণ” রচয়িতা কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র

মহাশয়ের বাস ছিল। তিনি রানীভবানীর সমসাময়িক ছিলেন। বগুড়া অঞ্চলে প্রচলিত "যোগীর কাছ" নামক লোকগীতি জীবনকৃষ্ণের রচনা বলিয়া কথিত।

বগুড়া হইতে সাত মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী মহাস্থান গড়ের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। বগুড়া হইতে মহাস্থান গড় পর্যন্ত করতোয়া নদীর তীর দিয়া পাকা রাস্তা আছে।

ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে যে মহাস্থান গড় প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর হইতে অভিন্ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পুণ্ড্রদেশ ও পৌণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে পুণ্ড্রদেশের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি নিজেকে বাসুদেব বা ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেন এবং বাসুদেবত্ব জ্ঞাপক শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম ছিল বাসুদেব এবং তিনিও এই সকল চিহ্ন ধারণ করিতেন। এই জন্য পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই সকল চিহ্ন ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথা উপেক্ষা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে দ্বারকাপুরী আক্রমণ ও অবরোধ করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নিহত

করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে পৌণ্ড্রদেশবাসিগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষভুক্ত হইয়া পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল।

প্রাচীন মানচিত্রে মহাস্থান গড়ের নাম "মুস্তানগড়" রূপে লিখিত আছে। এই স্থানের "মহাস্থান" নাম হওয়া সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম তপস্যা করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ও শাস্ত্রানুসারে চতুঃষষ্টি দোষ-বিবর্জিত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরবর্তী এই স্থানটিকে আবিষ্কার করেন এবং এইস্থানে তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহার "মহাস্থান" নাম দেন। স্মরণাতীত কাল হইতে মহাস্থান তীর্থরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। উত্তরকালে এইস্থানে পুণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইলে ইহা পুণ্ড্রনগর, পুণ্ড্রবর্ধন, পৌণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত হয়। পুণ্ড্রবর্ধন অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বুদ্ধদেব পুণ্ড্রবর্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহাস্থানে আবিষ্কৃত মৌর্যযুগের একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহার শাসনকর্তা মহামাত্য নামে অভিহিত হইতেন। ৬৪০ খৃস্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং কামরূপ হইতে পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে করতোয়া অতি বিস্তৃত নদী ছিল। তিনি ইহাকে ক-নো-তু

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধনের পরিধি ছিল ৩০ লী বা ৫ মাইল। কথিত আছে বুদ্ধদেব ব্যতীত জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামীও ধর্মপ্রচারের জন্য পুণ্ড্রবর্ধন নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মহাস্থানে হিন্দুপ্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাস্থান তুর্কিগণের দ্বারা বিজিত হয়।

মহাস্থান হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে বিহার নামক গ্রামে ও পার্শ্বেই ভাসোয়া বিহার ও ভাসুবিহার গ্রামে পুরাতন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং যখন পুণ্ড্রবর্ধনে আগমন করেন তখন এইস্থানে তিনি একটি গগনস্পর্শী চূড়াসমন্বিত বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে পো-শি-পো বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সঙ্ঘারামে মহাযান সম্প্রদায়ের ৭০০ ভিক্ষু ও বিখ্যাত শ্রমণ অবস্থান করিতেন। তিনি সঙ্ঘারামের নিকটে মহারাজ অশোক নির্মিত একটি স্তুপ দেখিয়াছিলেন। স্তুপের স্থানটিতে পূর্বকালে ভগবান তথাগত তিনমাস ধরিয়া ধর্ম ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরে দূর দূরান্তর হইতে যাত্রী আসিয়া প্রার্থনা করিত। কানিংহাম সাহেব ভাসুবিহার গ্রামের ৭০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬০০ ফুট প্রস্থ ভগ্নাবশেষটি হুয়েনসাং বর্ণিত সঙ্ঘারাম বলিয়া নির্ণয় করেন এবং এখনও প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ ইষ্টক নির্মিত স্তুপটিকে

অশোক নির্মিত স্তূপ এবং ইহার উত্তরে মন্দিরের ভগ্নাবশেষকে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির বলিয়া অনুমান করেন। তৎকালে ভাসুবিহার বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এই স্থানের খ্যাতি সমগ্রভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভাসোয়া বিহার গ্রামে "সুসঙ্গ" দীঘি নামে একটি প্রাচীন দীর্ঘিকা আছে। প্রবাদ ইহা 'সুসঙ্গ' নামক রাজা দ্বারা খনিত। এই সুসঙ্গ রাজা কে ছিলেন জানা যায় নাই। মহারাজ বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট বিহার গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁর হারলতা নামক স্মৃতি সংগ্রহ এখনও প্রচলিত আছে। সুবিখ্যাত রামচরিত কাব্য রচয়িতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী মহাস্থানের অধিবাসী ছিলেন।

দেশ কালের পরিবর্তনে আধুনিক বিহার বা ভাসুবিহার সেই পূর্ব গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে; কিন্তু শহীদ-জননী বলিয়া ইহার এখনও বঙ্গের বহুস্থানের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার আছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গত ভাসুবিহার গ্রাম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকীর জন্মভূমি। ১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ২৭ তারিখ। সন্ধ্যা হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড়, অবিরলধারে বৃষ্টিপাত। যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল ততই দুর্যোগের আধিক্য হইতে লাগিল। ভীত সন্ত্রস্ত জনগণ দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইল। মাঝে মাঝে ভীষণ মেঘগর্জন তাহাদিগকে চকিত করিল মাত্র

কিন্তু জাগরিত করিতে পারিল না। এই অপ্রফুল্ল সময়ে বরেন্দ্রভূমে প্রফুল্ল ভূমিষ্ঠ হইলেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই বরেন্দ্রভূমে আর এক প্রফুল্ল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তিনিই দেবী চৌধুরাণী ওরফে প্রফুল্লমুখী।

বিহার বা ভাসুবিহার প্রফুল্ল চাকীর পূর্ব পুরুষদিগের আদি বাসস্থান নয়। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ প্রাণকৃষ্ণনারায়ণ চাকী পাবনা জেলার অন্তর্গত চাঁচকিয়া গ্রামে বাস করিতেন। প্রাণকৃষ্ণ চাকী উত্তর বঙ্গের এক বিশিষ্ট কায়স্থ বংশে খ্যাতনামা শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাণকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ পিতৃ বিয়োগের পর বগুড়ার অন্তর্গত মাদলা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে; জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রনারায়ণ, মধ্যম লক্ষ্মীনারায়ণ, ও কনিষ্ঠ চন্দ্রনারায়ণ। চন্দ্রনারায়ণ প্রফুল্লর পিতামহ। পিতৃবিয়োগের পর চন্দ্রনারায়ণ পৈত্রিক গ্রাম মাদলা পরিত্যাগ পূর্বক বিহার বা ভাসুবিহার গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এদেশের অনেকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান এত কম এবং অনেকে এত অলস যে তাহারা আপন আপন চেষ্টায় জীবিকা উপার্জন না করিয়া জ্ঞাতি বা কুটুম্বের অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা হীনতা ও কাপুরুষতা আর নাই। পরান্নে প্রতিপালিত হইবার প্রবৃত্তি যাহাতে মনে না আসে সে বিষয়ে চন্দ্রনারায়ণ বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং আপনার চেষ্টা ও পরিশ্রমে আপনার জীবিকা উপার্জন করা তিনি কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাসুবিহার সেই সময় হইতে চাকীবংশীয়দিগের বাসস্থান হইয়াছে। চন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজনারায়ণ। রাজনারায়ণ দুইটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তাঁর স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিতা হন। পরে তিনি পুনর্বার বিবাহ করেন। রাজনারায়ণের চারি পুত্র—প্রতাপচন্দ্র, জগৎনারায়ণ, চারুচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র; দুই কন্যা—কুসুম কামিনী ও সৌদামিনী।

প্রফুল্লর পিতা ও পিতামহ উভয়েই বুদ্ধিমান উপার্জনক্ষম এবং স্বধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকর্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। দান-শীলতা সৌজন্য এবং অতিথি অভ্যাগতের সেবা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণের জন্য বিহারস্থ চাকী পরিবার এখনও তাঁহাদিগের স্বদেশীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন ইঁহাদিগের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা তাঁহাদিগের পরিবারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

প্রফুল্ল যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন চাকী বংশের বিশেষ সৌভাগ্যের অবস্থা; সুতরাং তাঁহার জাতকর্মাদি অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল এবং চারি ভ্রাতার মধ্যে প্রফুল্ল সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। প্রফুল্লর পিতৃবংশের ন্যায় মাতৃবংশও এক সময়ে বগুড়া সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ছিল। তাঁহার জননী অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা ছিলেন। প্রফুল্লর জননী স্বর্ণময়ী দাসীর ন্যায় স্নেহপরায়ণা ও পরদুঃখকাতরা রমণী, স্বভাব কোমলা বঙ্গ মহিলাদিগের মধ্যেও অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। সহৃদয়তা,

বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণ প্রফুল্ল যেমন তাঁহার পিতৃপ্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার স্বাভাবিক সরল উদার মন ও প্রেম-প্রবণ কোমল হৃদয় তিনি তেমনই তাঁহার মাতৃপ্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

১২৯৮ সালে হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে তাঁহার পিতা রাজনারায়ণ ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। প্রফুল্লর বয়স তখন মাত্র তিন বৎসর। পিতার মৃত্যুর পর বিধবা মাতা ও ছোট তিনটি ভাইকে লইয়া প্রতাপচন্দ্র বড়ই কষ্টে পড়িলেন। এ সময় তিনি এফ, এ (বর্তমানের আই, এ) পাশ করিয়াছেন। কাজেই একটি চাকুরির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ও চেষ্টার ফলে বগুড়ার আব্দুল শোভান চৌধুরীর এস্টেটে সার্কেল অফিসারের পদে নিযুক্ত হইলেন। প্রফুল্লর ৫ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হইয়াছিল। বাড়ীতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্ণপরিচয় শেষ হইলে জ্যেষ্ঠ প্রতাপচন্দ্র তাঁহাকে নামুজা জ্ঞানদাপ্রসাদ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। প্রফুল্ল অবশ্য ক্লাসে “ফার্ষ্ট বয়” ছিলেন না। দিনরাত বই পড়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না। স্কুলের পড়া রীতিমত তৈয়ার করিতেন মাত্র। বাকী সময় খেলা-ধূলা করিতেন ও অন্যান্য ভাল বই পড়িতেন। গ্রাম্য শিক্ষায়তনের পাঠ শেষ করিলে তাঁহাকে রংপুর শহরে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠান হইল। তখন তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর। রংপুর স্কুলে পড়িতে গিয়া তাঁহার জীবনের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হইল।

এই সময় বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য বাংলার প্রাণকেন্দ্রে অন্তহীন জ্বালা ধরিয়াছে। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯০৫) গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল যে ১৬ই অক্টোবর তারিখে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। ক্রুদ্ধ বাঙালী পাল্টা জবাব দিয়া বলিল ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) হইতে আমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হইল। সারাবঙ্গের নেতৃবৃন্দের উৎসাহে সারাবঙ্গ ব্যাপিয়া "রাখীবন্ধন"-এর মিলনোৎসব সম্পন্ন হইল। গবর্ণমেণ্টও এই অপমান নীরবে সহ্য করিলেন না। ১৭ই অক্টোবর তারিখে কোন কোন স্থলে ছাত্রগণ উপবাস করিয়া নগ্নপদে বিদ্যালয়ে গমন করিল। ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে ও রংপুর স্কুলে এই অপরাধে বালকগণ দণ্ডিত হইল। ২২শে অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেণ্ট কার্লাইল সারকুলার জারি করিলেন, তাহাতে স্কুলের ছাত্রগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ হইল। ইহার ফল কিন্তু শুভ হইল না—এই সারকুলারের প্রতিবাদ স্বরূপে অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটি স্থাপিত হইল। ঐ দিন রংপুর জিলা স্কুলে প্রফুল্ল চাকী, পরেশ মৌলিক প্রমুখ কয়েকটি ছাত্র দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে প্রফুল্ল চাকী, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী, নরেন্দ্র নাথ সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, নরেন বক্সী, পরেশ মৌলিক প্রভৃতি ছাত্রগণ রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যপাড়ার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দেশকর্মী অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৫

খৃস্টাব্দে রংপুরে এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় ইহাই প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়।

প্রফুল্লর সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্তী ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। বৈদ্যনাথের নিকট একটি পাহাড়ের উপর বোমা পরীক্ষাকালে প্রফুল্ল চক্রবর্তী মারা যান।

স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দান করিবার জন্য বারীন ঘোষের রংপুর ভ্রমণকালে প্রফুল্ল চাকীর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। বারীন ঘোষ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী যুবকদের মধ্যে সামরিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলন করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় শত শত বাঙালী যুবক বীরধর্মে দীক্ষিত হইয়া মাতৃভূমির পরাধীনতা শৃঙ্খল মোচনে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের উর্বর ক্ষেত্রের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিপ্লবী নায়কগণ কেমন করিয়া বাংলার যুবজনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, কি করিয়া তাহাদের কল্পনাময় চিত্তকে ত্যাগ-ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিভাবে তাহাদিগকে সংকল্পে অটুট ও চরিত্রবলে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন তাহা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অপূর্ব গৌরবময় অধ্যায়।

১৯০৫ সালে বিখ্যাত বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় তখনকার পূর্ববঙ্গের প্রথম ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলার এক আদেশ জারি করেন যে, কেহ বরিশালের সদর রাস্তায় "বন্দেমাতম্" বলিতে পারিবে না এবং এইরূপ প্রচার হইয়াছিল

যে, কেহ বন্দেমাতরম্ বলিলে তাহাকে গুলি করিয়া মারা হইবে। চতুর্দিক বহু গুর্খা এবং পুলিশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এই অন্যায় আদেশের প্রথম প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় প্রাণাধিক পুত্র চিত্তরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দেশের জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিবে কি না? উপযুক্ত পুত্র চিত্তরঞ্জন প্রফুল্ল মুখে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পিতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি ঘোষণা করিলেন তাঁহার পুত্র চিত্তরঞ্জনই প্রথম বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিবে। অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সেক্রেটারী স্বর্গীয় শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, সঙ্গীতাচার্য স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির অগ্রণী হইয়া চিত্তরঞ্জন প্রথম বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করেন। গুর্খারা গুলি করিলনা বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে বৃষ্টির ধারার ন্যায় পুলিশদিগের রেগুলেশন লাঠি তাঁহাদের মস্তকের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহাকে মারিতে মারিতে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় একটি পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেয়। তাঁহার দেহ-নিঃসৃত রক্তে পুষ্করিণীর জল রক্তবর্ণ ধারণ করে। ঐ রূপ অবস্থায় জলে তাঁহাকে ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া একজন কনেস্টবল তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া পুষ্করিণীর ধারে ফেলিয়া রাখিয়া প্রস্থান করে। জনসাধারণ ইংরেজের রাজ্য শাসনের এইরূপ ভীষণ নমুনা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। বিপ্লবীরা ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া এতদিন ইংরেজের অত্যাচার ও অনাচারের

পৈশাচিক লীলা দেখিতেছিলেন ; কিন্তু এবার তাঁহাদের ধৈর্যের বাঁধ অটুট রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রের বিপ্লবীদের অসন্তোষ বহ্নিতেও ইন্ধন সংযুক্ত হইল। অনতিবিলম্বেই ইহার পরিচয় পাওয়া গেল। ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার এক বৈপ্লবিক সহকর্মীকে লইয়া রংপুর পৌঁছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের অত্যন্ত টাকার প্রয়োজন হয়। রংপুর সহর হইতে ১২ মাইল দূরে একটি বাড়ীতে স্বদেশী ডাকাতি করার আয়োজন করা হইয়াছিল। ইহাই বাংলা দেশের সর্বপ্রথম স্বদেশী ডাকাতির প্রচেষ্টা। প্রফুল্ল চাকী এই ডাকাতির প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

ইহার পর ফুলার সাহেবকে অনুসরণ করা হয়। ফুলার সাহেবের ধুবড়ি হইয়া রংপুর আসিবার কথা ছিল। ধুবড়িতে বৈপ্লবিকদলের একজন কর্মীকে পাঠান হইয়াছিল এইজন্য যে লাটসাহেবের স্পেসাল ট্রেন ধুবড়ী ছাড়িয়া রংপুরের দিকে রওনা হইলেই তিনি রংপুরে টেলিগ্রাম করিয়া সে খবর দিবেন। এদিকে স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল যে রংপুরে স্টেশন হইতে মাইলখানেক দূরে একটা সুবিধামত জায়গায় লাইনের নিচে ব্যাটারী লাগাইয়া বোমা রাখিয়া আসা হইবে। কোনক্রমে যদি বোমা না ফাটে সেই আশঙ্কায় স্থির হইয়াছিল যে স্টেশনের বিপরীতদিকে প্রফুল্ল চাকী ও অপর একজন কর্মী রিভলবার

সহ একটি লাল লণ্ঠন হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। তাঁহারা এমনভাবে লাল লণ্ঠনটা লাইনের উপর রাখিয়া দিবেন যাহাতে বিপদ সঙ্কেত বুঝিয়া ড্রাইভার লাট-স্পেশাল থামাইয়া দেয়। তখন প্রফুল্ল চাকী ও উক্ত কর্মী লাটের কামরায় ঢুকিয়া রিভলবার দিয়া তাঁহাকে খুন করিবেন ইহাই ছিল নির্দেশ। কিন্তু কয়েকদিন পরেই জানা গেল যে লাটসাহেব রংপুর দিয়া আসিবেন না তিনি স্টিমারে গোয়ালন্দ রওনা হইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের আদেশে প্রফুল্ল চাকী ও উল্লিখিত বিপ্লবী কর্মীটি ছুটিলেন গোয়ালন্দের দিকে। সেখানে যাইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে লাটসাহেব সেখান হইতেও স্পেশাল ট্রেনযোগে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। তাঁহারাও চলিলেন পিছনে পিছনে। যাইহউক তাঁহারা আর ফুলার বধ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফুলার সাহেবের তখন পতন ঘটিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ জনিত আন্দোলনের দাপটে 'বন্দেমাতরম্' তাঁহাকে সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে তুলনা করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। ইংলিশম্যান ফুলার সাহেবের পদত্যাগের সম্বন্ধে লিখিল ইহা বধ্যমঞ্চে হত্যার সামিল (Execution)। আন্দোলনকারীদের ভয় প্রদর্শনের কাছে ইহা আত্মসমর্পণ। ইহার অনিবার্য ফল পরিণামে ব্রিটিশ শক্তির রাজসিংহাসন স্বেচ্ছায় ত্যাগ (Abdication)।

১৯০৭ সনের প্রথমভাগে প্রফুল্ল চাকী রংপুর হইতে কলিকাতা যান ও মুরারীপুকুরের যুগান্তর দলের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের প্রথমভাগে রংপুর গুপ্ত সমিতির উপশাখার

প্রতিনিধিরূপে প্রফুল্ল কলিকাতা হেড্ কোয়াটারের (মূলকেন্দ্রের) সভ্য নির্বাচিত হইলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিপ্লবীর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং তাঁহারাও প্রফুল্লকে একজন অকৃত্রিম বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, প্রফুল্ল চাকী, বিভূতিভূষণ সরকার ইঁহারাই সমিতির প্রকৃত কার্য-কারক হইলেন। এদেশে তখন ফরাসী বিপ্লবের ছোটখাট অভিনয় চলিতেছিল।

সেখানে প্রফুল্ল সম্যকরূপে বিপ্লবধর্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্র ও সংযত হইয়া চণ্ডী, গীতা ও উপনিষদ্ পড়িতেন। চণ্ডীতে মায়ের চামুণ্ডারূপের সেই ভীষণ পূজামন্ত্র প্রফুল্লর বড় প্রিয় ছিল। স্তবের শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎপীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥
মৃণালায়তসংস্পর্শ দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥

তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ।।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্।।
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটি ভীষণাননম্।।
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ।।
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।।
চণ্ডা চণ্ডাবতীচৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতাম্।।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্।

ইহা দুর্গাপূজা নয়, কালীপূজা নয়, ইহা চামুণ্ডার পূজা—যে মূর্তিতে মা অসুর নাশ করেন, ইহা মায়ের সেই চামুণ্ডামূর্তি। এ মূর্তির ধারণা আমাদের আর হয়না—ভীষণতা যতদিন আমরা এমনই করিয়া আবার ভোগ করিতে না পারিব, ভীষণতায় যতদিন আবার এমনই করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতে না পারিব

ততদিন আমাদের এমূর্তির ধারণা করাও আর সম্ভব হইবে না। আমরা এখন বর্ষে বর্ষে শক্তি—আদ্যাশক্তির পূজার কথা কহিয়া থাকি কিন্তু সে কেবল মুখের কথা মাত্র। আদ্যাশক্তির মর্ম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ভুলিয়া গিয়া আমরা অতি কোমল-চিত্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা আর কষ্ট সহিতে পারি না, কষ্ট দেখিতে পারি না, সুতরাং কঠোর হইতেও পারি না।

এমন তন্ন তন্ন করিয়া যাঁহারা ভীষণতার সাধনা করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙালী হইলেও তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মানুষ, মানুষ মধ্যে যথার্থ আর্য। ভীষণতা লইয়া যে খেলা করিতে ভালবাসে সেই পৃথিবী লাভ করে—প্রকৃত মানুষ হয়। আটল্যান্টিকরূপ ভীষণতার সহিত খেলা করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ইউরোপ আমেরিকার অন্নভাণ্ডার লাভ করিয়াছে। আর উত্তমাশা অন্তরীপের ভীষণতার সহিত খেলা করিতে পারিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড ভারতের স্বর্ণভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াছিল। তান্ত্রিক সাধক ভীষণতা লইয়া খেলা করে বলিয়া সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—কোমল নয় লৌহদণ্ডবৎ কঠিন। ধ্রুব ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তাই তিনি বিধাতার নিকট হইতে ধ্রুব-লোক আদায় করিতে পারিয়াছিলেন। বোধ হয় প্রহ্লাদও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তেমন অষ্টে পৃষ্ঠে দড়—জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, বিষ খাইয়া হজম করে, হাতীর পদভরে ভাঙ্গে না—তান্ত্রিক সাধক না হইলে হইতে পারে কি?

ভবানীর বরপুত্র ছত্রপতি শিবাজী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।

আমরা কোমল হইয়া পড়িয়াছি তাই কষ্ট দেখিলে কাতর হইয়া পড়ি, কঠোরতাকে বর্বরতা বলি আর কঠিন কাজে পশ্চাৎপদ হই।

এই পূজার কল্পনা যাহাদের মনে উদিত হইয়াছিল, সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছুই ছিলনা। এই ভীষণতা যাহাদের এত প্রিয়, এত হৃদয়ের সামগ্রী তাহাদের কিছুতেই ভীত ও ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়, ভীত ও ত্রস্ত হইলে বুঝিতে হয় তাহাদের সারবত্তা ফুরাইয়া গিয়াছে—তাহাদের কার্যকালের অবসান হইয়াছে।

মায়ের চামুণ্ডারূপের উপাসনা প্রফুল্লর জীবনে শেষদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। গাড়ীতে চলিতে চলিতে তিনি চোখ বুজিয়া এই মন্ত্র ধ্যান করিতেন। এই মন্ত্রই প্রফুল্লর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবলম্বন ছিল। এই মন্ত্র তিনি কখনই পরিত্যাগ করেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে প্রফুল্ল মুরারীপুকুর বাগানে এক সংসার-ত্যাগী উদাসীন সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ করেন, তাঁহার নাম বিষ্ণুভাস্কর লেলে। শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষের তিনি গুরুদেব। এই যোগী ছেলেদের ধ্যান এবং বহুবিধ যৌগিক কার্যের উন্নতি সাধন দেখিয়া বড়ই প্রীত হন কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রফুল্লকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। প্রফুল্লকে দেখিয়া লেলে বলিলেন ছেলেটি অতি সুন্দর যোগ শিখিতে পারিবে; তাহাকে পাইলে তিনি সুন্দরভাবে রাজযোগ শিক্ষা দিতে

পারেন। তিনি গুরুদেবকে (শ্রীঅরবিন্দকে) বলিলেন। উত্তর পাইলেন—ছেলেটি বোধ হয় রাজী হইবেন না। অতঃপর তিনি চারু দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া সবকথা বলিলেন ; কিন্তু ভাবে বোধ হইল তিনি ফল সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন ছেলেকে লেলে বা অন্যকেহ লইয়া যাইবে ইহাতে চারু দত্ত মহাশয় ঘোর আপত্তি করিলেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য তীব্র বাদানুবাদ হইল। লেলে যোগীজনের অনুচিত উত্তেজনার সহিত বলিলেন—এমন সুলক্ষণ ছেলেটিকে নষ্ট করিয়া কি লাভ ? ইহাকে আমার সহিত দাও ; ইহাকে পরম যোগী করিয়া দিব। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিভূতির চিহ্ন বর্তমান।

এরূপ অন্ধকে চারু দত্ত মহাশয় কি বলিবেন ? তিনি উত্তর করিলেন—"আপনি মনে করেন শ্রেষ্ঠ ছেলেরা যোগাভ্যাস করিবে এবং নিকৃষ্ট ছেলেরা আমাদের কাছে আসিবে। অবশ্য ও যদি নিরাপদে থাকিবার জন্য আপনার সঙ্গে যাইতে চায়, যাইতে পারে, আমরা তাহাতে কোন আপত্তি করিব না।"

বারীন সেখানে উপস্থিত ছিল এবং বিরস মুখে সব শুনিতেছিল। চারু দত্ত মহাশয় তাহাকে প্রফুল্লকে ডাকিতে বলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রফুল্ল আসিল। গুরুদেব (শ্রীঅরবিন্দ) সব বুঝাইয়া বলিলেন। প্রফুল্ল সব কথাই স্থির হইয়া শুনিল এবং গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে

অন্যত্র কোথাও সরাইয়া না দিতে চান আমি কোথাও যাইতে চাহিনা।”

এখানেই এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হইয়া গেল। ইহার পরে লেলে একাই বরোদায় ফিরিয়া গেলেন।

এখন হইতে প্রফুল্লর শক্তি ও বিপ্লব ধর্মকে আপনার মধ্যে একান্ত করিয়া তুলিবার বিচিত্র উত্তম আমরা লক্ষ্য করিব।

১৯০৭-এর শরৎকালে কয়েক সপ্তাহের জন্য চারু দত্ত মহাশয় দার্জিলিংএ অবস্থান করিতেছিলেন। পরিপূর্ণ শরৎ। বাংলার ছোটলাট স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজারকে অনেকগুলি উৎসব ও সভাদির কার্যে যোগদান করিতে হইবে। একদিন না একদিন বিপ্লবীরা তাঁহাকে কোন না কোন খানে সুবিধায় পাইবেই। চারু দত্ত মহাশয় মোটামুটি সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন যে তিনি স্টেশনের নিকটবর্তী গির্জায় প্রতি রবিবারের প্রভাত প্রার্থনায় যোগ দিয়া থাকেন এবং প্রথমে বড় ঘোড়ায় চড়িয়া অকল্যাণ্ড রোডের উপর দিয়া এবং পরে আঁকাবাঁকা পথ দিয়া নামিয়া আসেন; সঙ্গে একজন মাত্র দেহরক্ষী থাকে। বারীনের নিকট হইতে বোমা পূর্বেই আসিয়াছিল এবং প্রফুল্ল চাকীও পৌঁছিয়াছিল। চারু দত্ত মহাশয় প্রফুল্লকে সব বুঝাইয়া দিলেন। তাহাকে আঁকাবাঁকা পথের সম্মুখে শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং গভর্ণর যখন ঐ পথ দিয়া যাইবেন তখনই তাঁহার উপর উহা নিক্ষেপ করিতে হইবে।

তাঁহারা দুইজনেই ভাবিয়াছিলেন এবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু তবুও এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। চারু দত্ত মহাশয় ঐ নিম্নগামী পথের শেষ প্রান্তের অনতিদূরে খাড়া দাঁড়াইয়াছিলেন—কতক্ষণে বিস্ফোরণ শব্দ শুনিতে পাইবেন। কিন্তু কোন শব্দই কানে আসিল না। তবে কি প্রফুল্ল ধরা পড়িল? হঠাৎ তিনি দেখিলেন বাজারের পথ ধরিয়া গভর্ণর এবং তাঁহার দেহরক্ষী অশ্বারোহণে আসিতেছেন। ইহা একেবারে অভাবনীয় যে লোকের ভিড় এবং ধূলার মধ্য দিয়া কার্ট রোড (Cart Raod) ধরিয়া রবিবারে লাট সাহেব আসিবেন।

গভর্ণর গির্জার মধ্যে প্রবেশ করিলে সাদাসিদা পোষাকে দুই জন ইংরাজ পুলিশ গির্জার চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘুরিয়া আসিল। বুঝা গেল গোয়েন্দা বিভাগের পরামর্শেই গভর্ণর অসম্ভব পথ ধরিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে প্রফুল্লর সঙ্গে চারু দত্ত মহাশয়ের দেখা হইলে প্রফুল্লর মুখে তিনি শুনিলেন যে সে পুরা এক ঘণ্টা "মহাপুরুষের" জন্য অপেক্ষা করিয়া নিরাশ হইয়া আবাসে ফিরিয়াছে।

তারপর আবার নূতন করিয়া মতলব আঁটা হইল। পর সপ্তাহে সারাদিন ক্রিকেট ম্যাচ ছিল এই সময়কার শ্রেষ্ঠ খেলা—এক দিকে গভর্ণরস্ ইলেভন্ অপর দিকে কোচবিহার টিম। ফ্রেজার এমন উপাদেয় খেলা কিছুতেই বাদ দিবেন না। পরদিন সকালে চারু দত্ত মহাশয় গিয়া জায়গাটা বেশ করিয়া

দেখিয়া আসিলেন—কোন্ খানে লাট সাহেব ও সেখানকার গণ্যমান্য লোকেরা বসিবেন তাহারও একটা আন্দাজ করিয়া আসিলেন। ক্রিকেট ম্যাচের শেষে একটা ছোট পাহাড়ের অংশ; তাহারই উপর ঠিক সম্মুখভাগে গভর্ণরের আসন থাকিবে। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বসিবেন ছোটপাহাড় হইতে পঞ্চাশ গজ দূরে নিচেকার একটি স্থানে সামিয়ানার তলায়। আগের রাত্রে প্রফুল্ল চারু দত্তের সঙ্গে দেখা করিল এবং তিনি তাহাকে এ সম্বন্ধে শেষ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। স্থানীয় অতিথিদের সামিয়ানার নিচে চারু দত্তের পিছনে প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং তিনি চোখ বা হাত দিয়া ইঙ্গিত করিবা-মাত্র সে ছোট পাহাড়ের উপরকার সম্মুখের আসনের উপর বোমা ছুঁড়িবে। তারপর তাঁহারা পরম আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সারাদিন কাটিয়া গেল, খেলা শেষ হইল, কিন্তু তবুও তাঁহাদের শিকার আসিল না। চারু দত্ত মহাশয় আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না—কিন্তু শান্তভাবে হাস্যমুখে ধীরে ধীরে প্রফুল্ল স্থান ত্যাগ করিল।

পরদিন সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। ইহার পর প্রফুল্ল চাকী ও অন্যান্য কয়েকজন বিপ্লবীকে বাঁকুড়ায় একটি ডাকাতি করিবার জন্য পাঠান হয়। কিন্তু এ ডাকাতি শেষ পর্যন্ত হয় নাই।

বাংলার ছোটলাট স্যর এনড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন ধ্বংস করিয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়। ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে

প্রথম সে চেষ্টা হয়। বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকার চন্দননগর যান। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ইহার পর নারায়ণগড়ে ছোটলাটের ট্রেন উড়াইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা হয়। সে ১৯০৭ সনের ডিসেম্বরের কথা। স্থান নির্বাচনের জন্য প্রথমে হরিশ ঘোষ ও শান্তি ঘোষকে পাঠান হয়। কিন্তু তাঁহারা স্থান নির্বাচন ভাল ভাবে করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকারকে পাঠান হইল। নারায়ণগড় ও বেনাপুর স্টেসনের মধ্যে একটা স্থান তাঁহারা মাইন বসাইবার জন্য ঠিক করেন এবং সেই স্থানের একটা নক্সা প্রস্তুত করিয়া লন। ৬ই ডিসেম্বর রাত্রিতে তাঁহাদের পূর্ব-নির্বাচিত স্থানে ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের জন্য প্রায় একফুট গর্ত করিয়া বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি সরকার মাইন পুঁতিয়া রাখেন। সে মাইন ৬ পাউণ্ড ডিনামাইটে তৈয়ারী ছিল। ফিউজ রেল লাইনের উপরে রাখিয়া একটা সূতার সঙ্গে পাথরের ঢিল বাঁধিয়া দেওয়া হয় যেন হাওয়ায় উড়িয়া না যায়। বোমা ফাটিল, রেলও বাঁকিল কিন্তু গাড়ী উড়িল না। তবে ইঞ্জিনখানা জখম হইল এবং খড়্গপুর স্টেসন হইতে অপর একটা ইঞ্জিন লইয়া গিয়া লাটসাহাবের স্পেশালকে টানিয়া আনিতে হইল।

এই সময় ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের আশে পাশে পুলিশের ঘোরাঘুরি বাড়িয়াছে দেখিয়া নাটোরের সতীশ সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি সরকার ও

প্রফুল্ল চাকী দেশটা একটু ঘুরিয়া দেখিবার জন্য সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা হইতে গয়া ও তথা হইতে বাঁকীপুর পৌঁছিয়া সেখানে উকিল কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তাঁহারা উঠেন। বাঁকীপুরে একদল উদাসী সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবী সাধুর সহিত তাঁহাদের মিশিবার সুবিধা হইয়া গেল। নেপালে "ধুনি সাহেব" নামে উদাসী সম্প্রদায়ের এক তীর্থস্থান আছে। সাধুরা সেই তীর্থদর্শন করিতে যাইতেছিলেন। "ধুনি সাহেব" কাঞ্চনজঙ্ঘার নিকট একটা মঠ। তাঁহারাও সাধুদের সহিত তীর্থদর্শনে যাত্রা করিলেন। সেদিন ছিল ১৯০৭ সনের ২৪শে ডিসেম্বর। তাঁহারা তিনদিন সেই "সিদ্‌পুরীতে" বাস করিয়া বাঁকীপুরে ফিরিয়া আসেন এবং তথা হইতে ৩২নং মুরারীপুকুর রোডে আসেন।

ইহার পর প্রফুল্ল একবার বিহার গ্রামে যান। ইহাই তাঁহার শেষ গ্রাম দর্শন। এই সময় কিংসফোর্ডের কোর্টে শ্রীঅরবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক বিপ্লবী নেতা ও কর্মীর বিচার ও শাস্তি হয়। বালক সুশীল সেনকে বেত মারিবার আদেশ দিয়াছিল এই কসাই কাজী কিংসফোর্ড। গুপ্ত চক্রের তিন জন নেতা (Big Three) অরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক ও চারু দত্ত মহাশয়ের আদেশে এই জজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়া হয় ও প্রফুল্ল চাকীকে এই কার্যভার দেওয়া হয়। যে বিচার-বুদ্ধি প্রবীণের নাই, যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা বীরের মধ্যেও দেখা যায় না, তাহা তাঁহাদের এই মন্ত্রশিষ্য প্রফুল্লর ছিল প্রচুর

পরিমাণে। আচারে ব্যবহারে কথায় কার্যে প্রতিদিন তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহারা তাঁহার উপর গুরুতর কার্যের ভার অর্পণ করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহা তিনি অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছেন। প্রফুল্লর প্রতিভাদীপ্ত অনিন্দ্য সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকিত না। প্রফুল্ল তাঁহাদেরই স্নেহের প্রফুল্ল—কুসুম হইতেও কোমল আবার বুঝি বজ্র হইতেও কঠোর।

লোক দেখিবামাত্র তাহাদের চরিত্র ও সামর্থ্য ঠিক বুঝিয়া প্রত্যেককে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করাই প্রকৃত গঠন-কর্তার গুণ। শ্রীঅরবিন্দের এই আশ্চর্য গুণ ছিল। আর তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি ছিল চুম্বকের মত। দেশের যত সৎ দক্ষ মহৎ লোক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিত তাহাদের সন্তুষ্ট রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে তিনি আন্তরিক ভক্তি এবং একান্ত বিশ্বাস ও সেবা লাভ করিতেন। নেতা ও কর্মীরা তাঁহার আদেশ সর্বদা শিরোধার্য করিয়া লইত। এখন প্রফুল্লর আনন্দের সীমা নাই! তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন আজ তাঁহার বিপ্লব ও শক্তি-সাধনা সার্থক হইল।

হেমচন্দ্র দাশ মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসুকেও এই সঙ্গে পাঠাইতে চাহেন, তাঁহাকেও যাইতে অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রফুল্ল সেই আজ্ঞা পালন করিবার জন্য কলিকাতার ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ী হইতে বোমা ও পিস্তল সহ

মজঃফরপুর রওনা হন। হেমচন্দ্র দাশ ও উল্লাসকর দত্ত ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনে একটা কাঠের হাতলদ্বারা ঐ বোমা তৈয়ার করেন। হাওড়া স্টেশনে ক্ষুদিরাম বসু প্রফুল্লর সহিত মিলিত হন। ক্ষুদিরাম বসু মুরারীপুকুরের বাগান বা গোপীমোহন দত্ত লেনের কথা জানিতেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষুদিরাম বসু

জন্ম বাল্য কৈশোর

হিন্দুর গৌরবসূর্য অস্তমিত হইলে ইসলাম ধর্মের অর্ধচন্দ্র পতাকা ভারতগগনে শোভমান হইল। বহুদিনের শান্তিসুপ্ত হিন্দু মুসলমানের রণতাণ্ডবে ভীত হইয়া পড়িল। একদিকে সংসার-বৈরাগ্য বা ক্লীবত্ব অপরদিকে জীবনের অবসাদ উভয়ে মিলিয়া হিন্দুত্বকে যেন কোন্ কালসমুদ্রের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে "কাফের" অর্থাৎ বিধর্মী মনে করিয়া তাহাদের প্রতি প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। এইরূপে বিভেদের ভিত্তিতে এবং অত্যাচারের দ্বারা ক্রমশই নব্য উদীয়মান ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি ঘটিতে লাগিল। অন্যায় ও অত্যাচারে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহাতে কখনই মঙ্গল হইতে পারে না।

রাজা অত্যাচারী হইলে তাঁহার কর্মচারিগণও অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে না। ডিহিদার রায়জাদা উজির হইয়া প্রজাদের শাসন করিতে লাগিল এবং ধর্মাধর্ম জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রজাদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া ১৫ কাঠায় এক-বিঘা ধরিয়া জমির বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। উৎকোচগ্রাহী রাজপক্ষীয় লোকগণ বিনা উপকারে উৎকোচ গ্রহণ করিতে

লাগিল এবং পতিত ও অনুর্বর ভূমির কর নির্ধারণ আরম্ভ করিল। ডিহিদারের অত্যাচারে প্রজাদের ছয় সাত পুরুষের অধ্যুষিত বাসভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল। একদিকে জন্মভূমির চির উন্মাদ-করা স্মৃতি অন্যদিকে অভাবের নিষ্পেষণ তাহাদিগকে দুইদিক হইতে চাপিয়া ধরিল। দুঃখের মর্মান্তুদ ঘাত প্রতিঘাতে তাহাদের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ঠিক এই সময় এই স্বর্ণপ্রসূ রত্নগর্ভা শস্যশালিনী দেশের লোভে পাশ্চাত্যগণ ভিড় করিয়া আসিল তাহার নূতন আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া ভারতের উপকূলে।

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপণির
একধারে নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক লক্ষ্মী সুড়ঙ্গপথের
অন্ধকারে রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।"

কিন্তু এই বণিক রাজদণ্ড করে লইয়াও বণিকবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারিল না। শাসনের পরিবর্তে ইহার দক্ষতা প্রকাশ পাইল শোষণে।

যে সকলস্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্যোৎপাদিত হয় সেই সকলস্থানে ইউরোপীয়দিগের একবার পদার্পণ ঘটিলে সেই

সকল দেশের অধিবাসিদিগের ধ্বংস সাধন অবশ্যম্ভাবী। তাই যে সকল দেশে একবার ইউরোপীয়দিগের শুভাগমন ঘটিয়াছে সেইসকল দেশে অশান্তির কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। এই কারণেই ইউরোপীয়দিগের পদার্পণ ঘটিবার অব্যবহিত পরেই আমেরিকার আদিম নিবাসী এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বুভুক্ষিত ইউরোপীয়দিগের উদর পূরণ করিতে গিয়া এক টাকায় আট মণ চাউলের দেশে এক টাকায় সাত সের চাউল বিক্রীত হইতে লাগিল। যে দেশে "সর্বদেবময়োতিথি" বলিয়া অতিথি অভ্যাগতদের পূজা হইত সেই দেশের একজন আত্মীয় অপর আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিলে বিরক্তি অথবা অন্নব্যয়ের ভীতি জন্মিত। যে দেশের লোকে সাধারণত শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিত, যে দেশের লোকের পরমায়ু ১২০ বৎসর সেই দেশের লক্ষ লক্ষ লোক পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যেই পরলোক গমন করিতে লাগিল। ঐইরূপ এক অপ্রসন্ন সময়ে ১৮৮৯ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর (১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে অগ্রহায়ণ) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় মেদিনীপুর হবিবপুরে অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসু জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। তাঁহার পৈত্রিক বাটী মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণভূম পরগণার অন্তর্গত মোহবনী গ্রামে। ত্রৈলোক্যনাথ বসু মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁর এস্টেটের সদর কাছারীর তহশীলদার ছিলেন। তখনকার

দিনে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের তুলনায় ত্রৈলোক্যনাথের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তথাপি স্বামী স্ত্রীর মনে শান্তি ছিল না। কারণ লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে সেই সন্তান জীবিত থাকিত না। অপরূপা দেবী পিতা মাতার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও সরোজিনী দেবী মধ্যমা এবং ননীবালা কনিষ্ঠা। শ্রীমতী অপরূপা দেবীর পর ত্রৈলোক্যবাবুর আরও দুইটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমটি সূতিকাগৃহে এবং দ্বিতীয়টি ছয়বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিতামাতার সর্বশেষ সন্তান এই ক্ষুদিরাম।

ক্ষুদিরামের নামকরণের পিছনে একটি ইতিহাস আছে। ক্ষুদিরামের আগে আরও দুই ভাই ছিল; কিন্তু অল্প বয়সেই তাহারা মারা যায়। কাজেই ক্ষুদিরামের জন্ম হইবার পর গ্রাম্য সংস্কার অনুযায়ী তাঁর মা ছেলের উপর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগের ভাণ করিয়া তিনমুঠা ক্ষুদের বিনিময়ে ইঁহাকে বিক্রয় করিয়া দেন। কিনিয়া লন তাঁর বড় দিদি অপরূপা দেবী। ক্ষুদ দিয়া কেনা হইয়াছিল বলিয়া নাম হইল ক্ষুদিরাম। তার পরেই আসিল ভাগ্যের বিড়ম্বনা। দুর্ভাগ্য লইয়া যে জন্মিয়াছে সৌভাগ্য তাহার চিরস্থায়ী হইবে কি করিয়া? জীবনকে এত সহজভাবে উপভোগ করা তাহার ভাগ্যে সহিল না।

ক্ষুদিরামের বয়স যখন মাত্র ৬ বৎসর তখন ১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (১৮৯৫ খৃঃ ১৮ই অক্টোবর) তাঁহার মাতা

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পরলোক গমন করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই ১৮৯৬ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ক্ষুদিরামের পিতা ত্রৈলোক্য-নাথেরও মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্বে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

পিতামাতার মৃত্যুর পর অবিনাশচন্দ্র বসু নামক ক্ষুদিরামের এক জ্ঞাতি খুল্লতাত ভাই ক্ষুদিরাম ও ভগ্নী ননীবালার লালন পালনের ভার লইয়াছিলেন এবং আনন্দপুর গ্রামে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ননীবালার বিবাহ হইয়া যাইবার পর ক্ষুদিরাম নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন। জীবনের প্রথম হইতেই তাঁহার দুঃখবেদনার সঙ্গে পরিচয় এবং পৃথিবীতে একাকী অবজ্ঞাত জীবন যাপনের জন্য প্রথম হইতেই তাঁহার উপর ভাগ্যের নির্দেশ আসিয়াছিল। যে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে তিনি বাস করিতেছিলেন সেখানে দেখিতে পাইলেন মমত্ববোধ ও সহানুভূতির অভাব। সুতরাং তথায় আর এক মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। মনের এই অবস্থায় ক্ষুদিরাম একদিন গোপনে তথা হইতে একক পদব্রজে মেদিনীপুর শহরের দিকে যাত্রা করিলেন। আনন্দপুর হইতে মেদিনীপুরের দূরত্ব আট মাইলের কিছু অধিক। ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর শহরে পৌঁছিয়া তথায় হবিবপুর মহল্লায় কৃত্তিবাস বসুর বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রায় সপ্তাহকাল পর তাঁহাকে তমলুকে তাঁহার ভগিনীপতি অমৃতলাল রায়ের বাসভবনে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রীমতী অপরূপা দেবীর স্বামীর নাম অমৃতলাল রায়। সে সময়ে তাঁহার চাকুরীস্থল ছিল তমলুক শহর। শ্রীযুক্তা অপরূপা দেবী পিতৃমাতৃহীন বালক ক্ষুদিরামকে নিজের নিকট রাখিয়া সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ক্ষুদিরাম মাতৃস্বরূপা এই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্নেহ আদর পাইয়া পিতামাতার অভাব জনিত দুঃখ ভুলিতে লাগিলেন। তবে মানুষ শৈশবে যাহা কিছু পাইয়া থাকে শিশু ক্ষুদিরাম তার কোনটাই পান নাই। তমলুক আসিয়া ক্ষুদিরাম ভাগিনেয় ললিত রায়ের সহিত বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরে অমৃতবাবু তাঁহার পুত্র ললিতকে ও ক্ষুদিরামকে তমলুক হ্যামিলটন স্কুলে নিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি করিয়া দেন। ১৯০৩ সন পর্যন্ত ঐ স্কুলে ক্ষুদিরামের পড়াশোনা চলে। তারপর অমৃতবাবু মেদিনীপুর বদলী হন। ক্ষুদিরাম ও ললিতকে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে (Class VII) ভর্তি করা হইল। ১৯০৫ খৃঃ ক্ষুদিরাম এবং তাহার ভাগিনেয় ললিত চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রমোশন পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে (Class VIII) উঠিল। ঐ বৎসরের আগস্ট মাস পর্যন্ত ক্ষুদিরামের লেখাপড়া নিয়মিত ভাবেই চলিল। অতঃপর ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ক্ষুদিরাম স্কুল ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর তদবধি তাঁর ধর্মজীবন ও কর্মজীবন উভয়ই এক অভিনব পথ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

নিজের পাড়ায় যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর

দেখিতেন তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। কাহারও পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন। যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকটে নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ক্ষুদিরাম অন্যকে দয়া করিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই ক্ষুদিরামের মধ্যে দ্রোহি-চরিত্র রচিত হয়। দ্রোহিতা মাত্রেই প্রবল রাজসিকতার ফল। সমাজ-সংস্কারকেরা সকলেই রাজসিক স্বভাবের লোক। এমন কি পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে সকল যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ বা অবতার নব নব যুগ ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাদের সকলকেই স্বকার্য সাধনের জন্য এই রজোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্য আমাদের দেশের যুগাবতার মাত্রেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। এক পরশুরামকেই ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই, কিন্তু পরশুরামও ব্রাহ্মণকুলেই কেবল জন্মিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পালন করেন নাই; জন্মে ব্রাহ্মণ হইয়াও কর্মে সর্বতোভাবেই তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন।

মেদিনীপুরে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রচেষ্টায় তাঁহার ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুদিরাম অচিরেই এই গুপ্ত সমিতির সভ্য হইলেন। গুপ্ত সমিতিতে যোগদান ক্ষুদিরামের জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সেই দিনই পরবর্তী ক্ষুদিরামের জন্ম হইল।

১৯০৫ সালের ১৬ই জুলাই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা করিলেন। যুগ যুগান্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বন্ধন, জাতীয়তার নিবিড় আবেদন, ভৌগোলিক সংস্থানের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য সমস্তই বিপর্যস্ত হইতে চলিল সাম্রাজ্যবাদের কূট কুটিলতার লৌহচক্রে। জাতির অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করিল, জাতির সুপ্ত আত্মা জাগরিত হইল অমৃত মন্ত্রের দীক্ষা লইয়া। কার্জনের কার্যে অনেকের মনের সনাতন জড়তায় আঘাত লাগিয়াছিল সুতরাং বিদ্রোহী দল ক্রমশই পুষ্ট হইয়া পড়িল। সত্যেন্দ্রনাথ ও ক্ষুদিরাম এই বিপ্লবমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইলেন। শ্রীঅরবিন্দ ও মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাসের সহিত তাঁহাদের যোগসূত্র স্থাপিত হইল। মেদিনীপুর এই আন্দোলনে একক জেলা হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল। শক্তি ও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া মাতৃপূজার আহ্বানে যে সব যুবক আগাইয়া আসিলেন ক্ষুদিরাম তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ্য হইল বৃটিশ বিতাড়ন যাহার জন্য যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা রহিবে না। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এই আপনভোলা বিপ্লবী তরুণদের নেতা। ক্ষুদিরামকে তিনি বিশেষরূপে স্নেহ করিতেন। শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসু ছিলেন মেদিনীপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাস্টার। তিনি অবসর লইয়া দেওঘরে বাস করিবার পর তাঁহার ভাই দুর্গানারায়ণ বসু হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। মেদিনীপুরের কেন্দ্রীনেতা জ্ঞান বসু ও

সত্যেন বসু তাঁহারই ভাই অভয়চরণ বসুর পুত্র; কর্ণেল-গোলাতে তাঁহার বসতবাটী এখনও আছে। জ্ঞান বাবু তখন নাড়াজোলের রাজা বাহাদুরের সহিত কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) বয়সে প্রৌঢ় হইয়াও এই দলেরই একজন ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ হেমচন্দ্রকে স্বয়ং বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। হেমচন্দ্র দাসকে ফ্রান্সে মাদাম কামা ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার কাছে পত্র দিয়া বিস্ফোরক বিজ্ঞান শিখিতে পাঠানো হয়; সে হইতেছে ১৩ই আগস্ট ১৯০৬। রাজদ্রোহ সূচক কোন কার্যের জন্য ১৯০৬ এ ক্ষুদিরাম একবার ধরা পড়ে। কিন্তু তাঁহাকে বিচারের জন্য অভিযুক্ত না করিয়া কোন বড় ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং তাঁহার প্রতি অসামান্য সৌজন্য দেখান। পুলিশ তাঁহাকে সিগারেট, ভাল খাবার, এমন কি এক নারী সঙ্গিনী পর্যন্ত দিল। কিন্তু এত করিয়াও পুলিশ তাঁহাকে হস্তগত করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার কর্তব্যে তবুও অবিচল রহিলেন। ক্ষুদিরামের সহিত বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে নেতৃত্রয় (Big Three) শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক ও চারু দত্ত মহাশয় ক্ষুদিরামকে পূর্ববঙ্গ ও আসামে একটি বিশেষ কার্য সাধনের জন্য নির্বাচিত করেন। ঐ প্রদেশের গভর্ণর ফুলারের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। ক্ষুদিরামকে তখন একটা রিভলবার দিয়া ফুলারের লীলাখেলা শেষ করিবার জন্য পাঠানো হইল। কিন্তু বেচারার ভাগ্যে সুফল ফলিল না। পুলিশ অতি সতর্ক ছিল এবং গভর্ণরের গতিবিধি তদনুসারে

গুপ্ত, অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত হইতে লাগিল। চেষ্টা বিফল হইল। তথাপি ক্ষুদিরামকে তাঁহার সুনাম রক্ষার্থে আর একটি সুযোগ দেওয়া স্থির হইল।

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশাল কনফারেন্সে পুলিশের লাঠির ঘায়ে দেশ যজ্ঞ পণ্ড হইল। ইহার পর ১৯০৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্স হয়। সত্যেনবাবুর ইঙ্গিতে বালক ক্ষুদিরাম এই কনফারেন্সে কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে বিদ্রোহ-মূলক গুপ্তপুস্তিকা "সোনার বাংলা" ও "নো কম্প্রোমাইজ" (আপোষ চাইনা) বিতরণ করিতে গিয়া ধরা পড়ে। সত্যেন বাবুর চেষ্টায় ক্ষুদিরাম মুক্তিপায়। তখন সত্যেন কালেক্টরীতে একটি কেরানীগিরির চাকুরী করিতেন। এই ঘটনার কর্ণধার সন্দেহে ম্যাজিস্ট্রেট সত্যেনকে কড়া জেরা করেন। আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া নীরব থাকায় তাঁহার কেরানীগিরিটি খসিয়া যায়।

গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ১৯০৭ সালে ক্ষুদিরাম একবার হাটগাছায় গমন করিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীষণ গণ্ডগোলে চমকিত হইয়া গ্রামবাসী বাহির হইয়া দেখিল যে একজন ডাকহরকরা প্রহৃত হইয়া আর্তনাদ করিতেছে। কে যেন তাহার ডাক লুঠিয়া লইয়াছে। অপরূপা দেবী দেখিলেন যে ক্ষুদিরাম গৃহাভ্যন্তরে হাঁপাইতেছে। সেই রাত্রেই ক্ষুদিরাম বাহির হইলেন এবং বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে রওনা হইলেন।

বাল্য জীবনের কঠোরতা তাঁহার সহজাত চিন্তাশক্তিকে অল্প বয়সেই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল।

একবার অপরূপা দেবী বিবাহ করার জন্য ক্ষুদিরামের উপর চাপ দেন। ইহার উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেন যে বৃটিশগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইবার পর তিনি বিবাহ সম্পর্কে চিন্তা করিবেন।

এই সময় কলিকাতায় একদিন আদালতগৃহে রাজনৈতিক মামলার বিচারকালে পুলিশের সহিত সমবেত জনতার একটি সংঘর্ষ হয়; তখন সুশীল সেন এক সশস্ত্র ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীকে এরূপ ঘুসি মারেন যে তাহার নাক ভাঙ্গিয়া যায়। কিংসফোর্ড সাহেব সুশীলের এই অপরাধে তাঁহাকে বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় ১৫ ঘা বেত্রাঘাত করায় সুশীল সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। এই নিগ্রহ-নীতির জন্য বিপ্লবীগণ পূর্ব হইতেই কিংসফোর্ডের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। ইহার পর সুশীলের প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশে তাহাকে পৃথিবী হইতে একেবারে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। এই বর্বরোচিত দণ্ডাজ্ঞার পর সন্ধ্যা পত্রিকা কিংসফোর্ডকে কসাই কাজী কিংফর্দ বলিয়া উল্লেখ করিত। সুশীলের প্রশংসা করিয়া সন্ধ্যা পত্রিকা তখন লিখিয়াছিল:

"সুশীলের তুড়ি লাফ,
ফিরিঙ্গি বলে বাপ বাপ॥"

কলিকাতায় কিংসফোর্ডকে হত্যার প্রথম চেষ্টা পরেশ মৌলিক

ঘায়া করান হয়। তিনি আরদালীর বেশে একটা খুব মোটা আইন বইয়ের মধ্যে একটি বোমা লইয়া কিংসফোর্ডের চাপরাসির কাছে খুব চতুরতার সঙ্গে দিয়া আসেন। কিন্তু সেই সময় কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে বদলীর হুকুম পাইয়াছে বলিয়া পুস্তকখানি খুলিবার সময় পায় নাই। এমনি অন্যান্য পুস্তকের সহিত তাহা মজঃফরপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পরে বারীন্দ্র প্রভৃতি ধৃত হইয়া যে স্বীকারোক্তি করেন তাহাতে এই "বই বোমা" সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়। এই কথা শুনিয়া পুলিশ কমিশনার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ এমারসন সাহেবকে মজঃফরপুরে পাঠাইয়া দেন এবং কিংসফোর্ড সাহেবকে প্যাকিং বাক্সটি খুলিতে নিষেধ করিয়া টেলিগ্রাম করেন। পরে এমারসন সাহেব মজঃফরপুর গিয়া প্যাকিং বাক্সটি জলে ফেলিয়া "বই বোমার" সক্রিয়তা নষ্ট করেন এবং কিংসফোর্ড সাহেবও বাঁচিয়া যান।

শুনা যায় ইহার পর মজঃফরপুর গিয়া কিংসফোর্ডকে নিধন করিবার জন্য শ্রীরামপুরের নরেন গোঁসাই নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নাকি যাত্রার অব্যবহিত পূর্বেই গৃহিণীর মনোকষ্টের দোহাই দিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন।

অতঃপর কিংসফোর্ডকে নিধনের জন্য নির্বাচিত হইলেন প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর হইতে আনাইয়া প্রফুল্লকে দেখাইয়া বলিয়া দেওয়া হয়, ইহার নাম দীনেশ চন্দ্র রায়—বাঁকুড়ার একজন কর্মী। আর ক্ষুদিরামকে হরেন সরকার

বলিয়া প্রফুল্লকে জানাইয়া দেওয়া হয়। সাবধানতার জন্য এইরূপ করা হয়।

অতঃপর শ্রীবারীন ঘোষের উপদেশ ও আশীর্বাদ লইয়া মারণাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিপ্লবী ও বিপ্লবীগণতন্ত্রীদের হীন শত্রু কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য প্রফুল ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অগ্নিযুগের সাগ্নিক বাংলার শোণিত দান

অপরাহ্নে বিপ্লবীগণতন্ত্রীদের নিকট বিদায় লইয়া প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর রওনা হইলেন। কলিকাতা হইতে মজঃফরপুর ৩৭৫ মাইল। রাস্তায় কোথাও কোথাও পাহাড় অপেক্ষাকৃত কম, প্রান্তর বেশী। কোথাও কোথাও যথেষ্ট গাছ-পালা—শমী, পলাশ। মাঝে মাঝে রীতিমত পলাশবন। মোকামাঘাটে গঙ্গা পার হইতে হইল।

তাঁহারা সন্ধ্যার পর মজঃফরপুরে পৌঁছিলেন। শহর ষ্টেশনের সংলগ্ন। শহরের প্রবেশমুখে জমীদার পরমেশ্বর মাহাতোর ধর্মশালায় তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। সকালে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম শহর দেখিতে বাহির হইলেন। প্রথমেই কিংসফোর্ডের বাংলো দেখিয়া লইলেন। ইহার পর তাঁহারা একটি নকসা প্রস্তুত করেন। ধর্মশালা ও কিংসফোর্ড সাহেবের বাংলোর চিহ্ন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। মুরারীপুকুর বাগান খানাতল্লাসীর সময় তথায় পুলিস এই নক্সাটি পায়।

ধর্মশালায় থাকিবার সময় তাঁহাদের টাকার প্রয়োজন হয় এবং প্রফুল্ল কলিকাতা হইতে ২০৲ টাকা মণিঅর্ডার যোগে মাহাতো ওয়ার্ডস এস্টেটের হেড্ ক্লার্ক বাবু কিশোরী মোহন

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানায় আনাইয়া লন। কিশোরীবাবুর আফিস ছিল ধর্মশালারই একটি কামরায়।

মুরারীপুকুর বাগান খানাতল্লাস করিবার সময় দীনেশচন্দ্র রায় ওরফে প্রফুল্ল চাকীর সুকুদার নিকট লিখিত একখানি পত্র পাওয়া যায়। এই পত্রে টাকা হারাইয়া যাওয়ার কথা ছিল এবং দীনেশ রায়ের ঠিকানা ছিল পূর্বোক্ত কিশোরী বাবুর আফিস। পত্রখানি আলিপুর বোমার মামলার সাক্ষ্যস্বরূপ উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। পত্রখানি এইরূপ:

"প্রিয় সুকুদা, আমরা নিরাপদে এখানে এসে পৌঁছেছি। পথে দুর্গাদাসের পকেট থেকে সমস্ত টাকা হারিয়ে গেছে। সেইজন্য আমরা মহা বিপদে পড়ে গিয়েছি। দয়া করে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ২০৲ টাকা পাঠাবেন। পরে আপনাকে সমস্ত জানাবো।"

এই সময় প্রফুল্ল মুরারীপুকুরে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে একখানি পত্রে জানান "সুকুদা, বর দেখিনি কিন্তু বরের বাড়ী দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে ভাল রসগোল্লা পাওয়া যায় না—কিছু ভাল রসগোল্লা পাঠাতে ভুলিবেন না। —দীনেশ"

এই চিঠিতে লিখিত "বর" ও তাহার বাড়ীর প্রসঙ্গে আলিপুর বোমার মামলায় জজ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে বর কিংসফোর্ড ছাড়া আর কেহই নন।

একদিন দীনেশ কিশোরীবাবুর নিকট আসিয়া বলে যে পথে

তাহাদের টাকা হারাইয়া গিয়াছে। সেই জন্য সে কলিকাতা হইতে টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছে এবং তাঁহার ঠিকানায় মণি-অর্ডারে ২০৲ টাকা আসিবে। ৯ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে টাকা আসে এবং ডাকহরকরা মণিঅর্ডার লইয়া কিশোরীবাবুর নিকট উপস্থিত হয়। কিশোরীবাবু ধর্মশালার চৌকিদার খৈমন কাহারকে বলেন দীনেশ ওরফে প্রফুল্লকে ডাকিয়া দিতে। ধর্মশালার যে অংশে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বাস করিতেছিলেন সেই অংশে খৈমন যাইয়া দেখিতে পায় যে তাঁহাদের কামরার দরজায় তালা আটকান আছে—তাঁহারা ধর্মশালায় নাই। খৈমন কিশোরীবাবুকে এই খবর দিবার পর কিশোরীবাবু মণিঅর্ডার ফেরৎ না দিয়া স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রফুল্লর পক্ষ হইতে মণিঅর্ডারে দস্তখত করিয়া টাকা নিজে রাখিয়া দেন। অপরাহ্নে প্রফুল্ল আসিলে তাঁহার হাতে মণিঅর্ডারের ২০৲ টাকা দেন ও প্রফুল্লর নিকট হইতে সাদা কাগজে এই টাকা প্রাপ্তির একটি রসিদ লইয়া ক্যাশবাক্সের এক পার্শ্বে রাখিয়া দেন।

১০ই এপ্রিল প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ধর্মশালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর পৌঁছিয়া মজঃফরপুর হোটেলের খাবার আর বাংলাদেশের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এই দুইয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মন তিক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। কিশোরীবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামকে তাঁহার বাসাবাড়ীতে লইয়া গিয়া

কয়েকদিন খাওয়াইয়াছিলেন। কিশোরীবাবুর তখন বাসাবাটী ছিল কাজী মহম্মদপুর এলাকার সিউহর ছাউনীতে।

ইহার কয়েকদিন পর মজঃফরপুর কোর্টে কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম দিনের বেলায় শহরে উপস্থিত হন কিন্তু কোর্টে বোমা নিক্ষেপ করিলে বহু লোকের প্রাণ যাইবে আশঙ্কায় আদালতে সেই ভীষণ বোমা ব্যবহার করেন নাই।

এবার তাঁহারা দুইজনে পৃথক পৃথক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—ক্ষুদিরাম পরমেশ্বর মাহাতোর ধর্মশালায় রহিলেন আর প্রফুল্ল সরাইগঞ্জে অবস্থিত বাঙালীদের একটি মেসে আশ্রয় লইলেন। ইহার পর তাঁহারা কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং শহরের পথঘাট চিনিয়া লইলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ২০শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটরূপে কয়েকটা রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় শাস্তি দেওয়ার জন্য মজঃফরপুরের সেসনস্ জজ কিংসফোর্ড সাহেবকে চরমপত্র প্রেরিত হয়।

এই খবর পাইবার পর কিংসফোর্ড সাহেবের নিরাপত্তার জন্য তহশীলদার খাঁ ও ফৈজুদ্দিন নামক দুই জন কনস্টেবল্ নিযুক্ত হয়। তাহারা দিবা রাত্র কিংসফোর্ডের বাংলো পাহারা দিত।

কিংসফোর্ড সাহেবের বাংলোর নিকটেই ইউরোপিয়ান ক্লাব অবস্থিত। কিংসফোর্ড প্রতি সন্ধ্যায় ক্লাবে যাইত

এবং রাত্রি আটটার পূর্বেই বাংলোতে ফিরিত। সে তাহার ব্রুহাম গাড়ীতে করিয়া যাতায়াত করিত।

২৯শে এপ্রিল প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের বাংলোর নিকটবর্তী রেকেট কোর্টের নিকট যাইয়া উপস্থিত হন ও সেখানে কিংসফোর্ড সাহেবের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। সেই সময় আব্দুল করিম নামে একটি ছাত্র তাঁহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যায়। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম শেষকালে খেলার মাঠে যাইয়া ছাত্রদের ফুটবল খেলা দেখিতে লাগিলেন। পূর্বোক্ত করিম ও খেলোয়াড়দের বারংবার অনুরোধে প্রফুল্ল ফুটবল খেলিতে আরম্ভ করিলেন। পুরোভাগে প্রফুল্ল উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। প্রফুল্লর গতিবেগ সকলকেই হার মানায়। প্রফুল্ল যে দলের হইয়া খেলিলেন সেই দিন প্রফুল্লর ক্রীড়ানৈপুণ্যে তাহারা তিন গোলে জয়ী হইল। সকলেই প্রফুল্লর খেলার প্রশংসা করিতে লাগিল এবং পরদিবস তাঁহাকে খেলিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইল।

১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) সন্ধ্যার পর সুযোগমত বোমা নিক্ষেপ করা ঠিক হইয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম বোমা রিভলবার এবং পিস্তল লইয়া অমাবস্যা রাত্রির অন্ধকারে ইউরোপীয়ান ক্লাবের প্রবেশ দ্বারে একটি গাছের আড়ালে অন্যের অগোচরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সদস্যরা সন্ধ্যার নির্দিষ্ট পাত্রগুলি নিঃশেষ করিয়া আরও

পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। ক্লাবের চতুঃসীমার বাহিরে জগৎ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও তাঁদের জানিবার অবসর ছিল না।

এদিকে ঈশানের বিষাণরবে প্রলয়ঝঞ্ঝার অকস্মাৎ আগমন সূচিত হইতেছে।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় যথারীতি ব্রুহাম গাড়ীটি ক্লাবগৃহ হইতে রওনা হইল। একটি গাছের আড়াল হইতে ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিল। এই বোমার শব্দ ২০ মাইল দূর হইতে শুনা গিয়াছিল। বোমা ফেলিয়া প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ঘটনাস্থল হইতে দুইজন দুইদিকে চলিয়া যান।

এ গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, তিনি ক্লাবেই ছিলেন। তাঁহার গাড়ীতে মজঃফরপুরের মিঃ প্রিংলি কেনেডি (Pringly Kennedy) নামক একজন ইংরেজ ব্যবহারজীবীর পত্নী ও কন্যা ছিলেন। তাঁহারা মারাত্মকভাবে আহত হইলেন। সহিসও আহত হইয়া রাজপথে আবিষ্ট অবস্থায় ঘুরপাক খাইতে থাকে।

সেই সময় রামনগর রাজার এস্টেট পরিদর্শক মিঃ উইলসন ঘটনাস্থলের সন্নিকটবর্তী ডাকবাংলোর বারান্দায় বসিয়াছিলেন; শব্দ শুনিয়া তিনি দ্রুত তথায় আসিয়া দেখিলেন যে গাড়ীখানি প্রচণ্ডভাবে জ্বলিতেছে। কিংসফোর্ডের বাংলোয় যে দুইজন পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ছিল তাহারাও উপস্থিত হইল। তাহারা উপস্থিত হইলে সহিস বলিল যে মেমসাহেবকে

বোমা মারিয়াছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ আহতদের বাহির করিবার ব্যবস্থা করিল। প্রজ্জ্বলিত গাড়ীর ধ্বংসস্তুপ হইতে আহতদের বাহির করিতে উদ্ধারকারীদিগকে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তাহারা মহিলাদ্বয়ের বস্ত্রের অগ্নি নির্বাপিত করিল এবং ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে কিংসফোর্ডের বাংলোয় আনিয়া যথাসাধ্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। বোমার টুকরার আঘাতের ফলে সেই রাত্রেই কেনেডী সাহেবের কন্যার (Miss Grace Ella Kennedy) মৃত্যু হইল। অর্ধ চেতন ও অস্থির অবস্থায় কেনেডী সাহেবের স্ত্রীকে (Mrs. Louic Ella Kennedy) হাসপাতালে ভর্তি করিবার ৮ ঘন্টা পর তিনিও মারা গেলেন। মিঃ কেনেডি এই সময় মজঃফরপুরে ছিলেন না। জমীদার পরমেশ্বর মাহাতোর জমীদারির কোনও আইন সংক্রান্ত কার্যে এস্টেটের ম্যানেজার অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর বাবু মহাদেব প্রসাদের সহিত তিনি মানভূম কোলিয়ারিতে ছিলেন।

এদিকে বোমা বিস্ফোরণের সংবাদ তখনই চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ঘটনার অব্যবহিত পরেই পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আরমস্ট্রং সশস্ত্র পুলিশবাহিনী লইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশে সশস্ত্র পুলিশ কিংসফোর্ডের বাংলোর চতুর্দিকে একটি সুদৃঢ় রক্ষাবলয় (রক্ষাব্যূহ) গড়িয়া তোলে এবং এক পুলিশ বাহিনী মজঃফরপুর শহরটিকে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত করিয়া

পাহারা দিতে থাকে। তিনি তার-যোগে নিকটবর্তী প্রত্যেক রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাসী করিবার আদেশ দিলেন এবং জানাইয়া দিলেন যে আসামীর সন্ধান পাওয়া মাত্রই নিকটতম থানায় অবিলম্বে খবর দিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সাহায্য চাহিতে হইবে এবং সেই সংবাদ প্রেরণের দ্রুততর উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে খবর দিতে হইবে। ধরিবার কাজে সাহায্য করিতে পারিলে গভর্ণমেণ্ট পুরস্কার দিবেন। পর দিবস প্রকাশিত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ব্যক্তিগত স্বাক্ষরযুক্ত এক ইস্তাহারেও ইহা বলা হয়। মজঃফরপুর শহরেও ঢোল সহরতে এই পুরস্কার ঘোষণার কথা জানাইয়া দেওয়া হয়।

পরবর্তী ট্রেনেই নানাদিকে ছদ্মবেশে পুলিশ কর্মচারী ও কনস্টেবল প্রেরিত হয়।

শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং নামক দুই জন কনস্টেবল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশে মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরবর্তী ওয়াইনী স্টেশনে (বর্তমানে পুসারোড স্টেশন) পৌঁছিল।

পুলিশ সুপারের আদেশে ঘটনার রাত্রিতেই প্রবাসী বাঙালীদের বাড়ীতে খানাতল্লাসী শুরু হইয়া গেল। মজঃফর-পুরের জনসাধারণের মারফৎ সেই রাত্রের যে খবর শুনা যায় তাহা সত্য হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে জনসাধারণই কেবল অরাজকতার সৃষ্টি করে না অনেক সরকারী কর্মচারীও অরাজ-কতার সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং অত্যাচারের মাপকাঠী দিয়া যাচাই করিতে গেলে এই সব অরাজকতার ভিতরকার গুরুত্ব

জনসাধারণের অরাজকতার গুরুত্ব অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প বলিয়া মনে হয় না।

পর দিবসও ১লা মে (১৯০৮) কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাস ও অস্বাভাবিক রকম জুলুম হইয়াছিল। ইহাদের কাজে মজঃফরপুর শহরের ভিতর ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইহার পর কেবলমাত্র মজঃফরপুরে নহে বাংলার সর্বত্রই কর্তৃপক্ষের এই জুলুম একান্তভাবেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

এদিকে ক্ষুদিরাম রাত্রির অন্ধকারে ২৪ মাইল অতিক্রম করিয়া প্রত্যূষে ওয়াইনী স্টেশনের নিকট পৌঁছিলেন। পথশ্রম, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তখন তাঁহার দেহমন অবসন্ন। ইহার পর ক্ষুদিরাম ওয়াইনী স্টেশনে এক মুদির দোকানে কিছু খাবার কিনিয়া খাইতে লাগিলেন। ক্ষুদিরাম ওয়াইনী স্টেশনে পৌঁছিবার সময়েই মজঃফরপুর হইতে আগত শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং দুইজন কনস্টেবল ক্ষুদিরামের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং দূর হইতে তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকে। ক্ষুদিরামের অন্যমনস্কতার সুযোগে তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। গ্রেপ্তার করার কালে তাঁহার নিকট হইতে দুইটি রিভলবার ও গোলাগুলি পাওয়া গেল।

শুক্রবার বেলা ১টার সময় ওয়াইনী স্টেসন হইতে টেলিগ্রাম আসিল ক্ষুদিরাম ধরা পড়িয়াছে। মজঃফরপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আরমস্ট্রং কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ লইয়া ওয়াইনী অভিমুখে রওনা হইলেন।

ইহ সংসারে দুঃসংবাদ বায়ু অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে চলে। ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের সংবাদ মজঃফরপুরবাসীদের নিকট পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই।

সংবাদ পাইয়া কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রের সংগঠককে দেখিবার জন্য দলে দলে অসংখ্য ব্যক্তি মজঃফরপুর স্টেশনে সমবেত হইতে লাগিল। অপরাহ্ন হইতেই পথ রোধ করিয়া অননুমোদিত বেসরকারী ব্যক্তিদিগকে স্টেশনে যাইতে বাধা দেওয়া হয় এবং খাকি শিরস্ত্রাণযুক্ত রক্ষিগণ মজঃফরপুর ইউরোপিয়ান ক্লাবগৃহ হইতে স্টেশনের বহির্দেশ পর্যন্ত সমগ্র রাস্তা পাহারা দেয়। এই সময় একটি ফিটনগাড়ী রেল স্টেশনের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকে।

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় একটি স্পেশাল ট্রেন আসিয়া মজঃফরপুর পৌঁছিল। একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে ক্ষুদিরাম ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবতরণ করিয়া সরাসরি নির্দিষ্ট ফিটনে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে আরও একজন সিনিয়ার পুলিশ অফিসার ছিলেন। ক্ষুদিরাম উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম্ বলিতে লাগিলেন। ফিটন ইউরোপিয়ান ক্লাবের দিকে রওনা হইল। পরদিবস Statesman পত্রে এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

"The Railway station was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old, who looked quite determined. He came out of a first class compartment and

walked all the way to phaeton, kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety...on taking his seat the boy lustily cried Bandemataram..."

ফিটন ক্লাবগৃহে পৌঁছিলে মজঃফরপুরের তদানীন্তন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মি: এইচ্, সি, উড্‌ম্যান ক্ষুদিরামের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ (Record) করিয়াছিলেন। ক্লাব গৃহের এক রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে ক্ষুদিরামের জবানবন্দী লওয়া হয়। ক্ষুদিরাম বলেন ঃ

আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু—বাড়ী মেদিনীপুর। এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিলাম। আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। তাহার ন্যায় উৎপীড়ক আর ভারতবর্ষে কেহ নাই। তাহাকে বধ না করিয়া দুইজন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে যে আমি হত্যা করিয়াছি, এ জন্য আমার মর্মান্তিক যাতনা হইয়াছে। আমি মেদিনীপুর হইতে এখানে আসিয়াছি। হাওড়ায় আমার সহচর দীনেশের সঙ্গে দেখা হয়। দীনেশের সঙ্গে একটা বোমা ছিল। দীনেশ বোমা তৈয়ার করিতে পারিত। আমার সঙ্গে দুইটা রিভলবার ও কতকগুলি গুলি ছিল। উহা আমি কলিকাতায় কিনিয়াছিলাম। আমরা ৭।৮ দিন পূর্বে মজঃফরপুরে পৌঁছিয়া ধর্মশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ধর্মশালার নিকট কিশোরী বাবুর আফিস ছিল। আমাদিগকে কেহ যখন জিজ্ঞাসা করিত যে আমরা কোথায় থাকি, আমরা বলিতাম কিশোরী বাবুর বাসায় থাকি।

আমরা সর্বদা কিংসফোর্ডের খবর লইতাম। আমরা দেখিলাম মিঃ কিংসফোর্ড কুঠী হইতে কয়েকগজ দূরবর্তী ক্লাব ব্যতীত আর কোথাও যান না। এক দিন কাছারীতে গিয়া দেখিলাম তিনি সেসনের বিচার করিতেছেন। একবার মনে হইল, তখনই বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সংহার করি, কিন্তু পরক্ষণে যখন মনে হইল, অনেক নির্দোষের মৃত্যু হইবে তখন ক্ষান্ত হইলাম। ৩০শে এপ্রিল মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ী যখন ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় ছিলাম। একখানা গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া আমি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমাদের উভয়ের পা খালি ছিল। বোমা নিক্ষেপের পর দীনেশ বাঁকীপুরের দিকে পলাইল আর আমি সমস্তিপুরের দিকে দৌড়িয়া গেলাম। ওয়াইনি স্টেশনে এক মুদির দোকানে যখন আমি জল খাইতেছিলাম, তখন তুইজন কনস্টেবল আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে। কলিকাতায় এক গুপ্ত সমিতি আছে সেই সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া খুব উত্তেজিত হইয়াছিলাম। যদি ধরা পড়ি তবে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে পিস্তল সঙ্গে রাখিয়াছিলাম।”

পরদিবস সকালে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উড্‌ম্যান বাঙালী উকীলদিগকে নিজের এজলাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সকলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটি

ক্ষুদ্রকায় যুবক। দীর্ঘঋজু আকৃতি দৃঢ় ছিপ ছিপে অথচ বলিষ্ঠ গড়ন। চোখ দুটি টানা টানা, সরলতা মাখা চাহনি। কিন্তু আজ তাঁহার চোখ জবাফুলের মত লাল। দৃষ্টি হইয়াছে ক্রুর কঠিন হিংস্র, মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তীব্র জীঘাংসা।

জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষুদিরামের পূর্বদিনের প্রদত্ত বর্ণনাটি পড়িয়া উকীলদিগকে শুনাইলেন। আরও বলিলেন যে এই নিরপরাধ বালককে যাহারা কুপথে চালিত করিয়া বিপন্ন করিয়াছে সেই নেতাদের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে আর তাহাদের বিরুদ্ধে সকল বাঙালীর আন্দোলন করা কর্ত্তব্য।

এজলাস হইতে উকীলবৃন্দ বার এসোসিয়েসনে ফিরিয়া আসিলে সরকারী উকীল শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তথায় এক জরুরী সভার অধিবেশন করিলেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নরহত্যা ডাকাতি ও ভীতিপ্রদ কার্যকলাপের জন্য যে সকল দল দায়ী তন্মধ্যে বাংলার বিপ্লবীদল অন্যতম। সরকার এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির সঙ্কল্প। সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন জনসাধারণ শীঘ্রই তাহা সমর্থন করিবেন এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনে সক্রিয় সহযোগিতা করিবেন বলিয়া আমরা

আশা করি। গত রাত্রির সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে এই শহরের সুনাম নষ্ট হইয়াছে।

শিববাবুর বিবৃতিতে উপস্থিত সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং উহাকে তাঁহারা হতাশাব্যঞ্জক উপদেশ বলিয়া অভিহিত করেন।

মজঃফরপুরের উকীল হৃষীকেশ চক্রবর্তী (কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র) সেখানে মন্তব্য করেন, "কামাখ্যাতে কাক মরেছে বৃন্দাবনে হাহাকার।" শিববাবু নেহাৎ ভদ্রলোক ছিলেন তাই তখনও হৃষীকেশ বাবুর উপর রাজদ্রোহিতার অভিযোগ আনেন নাই।

এদিকে প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া হাঁটা পথে মজঃফরপুর হইতে চার স্টেশন দূরবর্তী সমস্তিপুর পৌঁছিলেন। নিজেকে এর চেয়ে বেশী একান্তভাবে অসহায় বোধ হয় আর কোন দিন উপলব্ধি করেন নাই। প্রফুল্ল অতিকষ্টে তাঁহার দেহভার বহন করিয়া আশ্রয় অন্বেষণের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন বিপরীত দিক হইতে একজন বাঙালী ভদ্রলোক ঐ পথেই অগ্রসর হইতেছেন। আগন্তুক তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন আমি দূর হইতে আপনার দুরবস্থা দেখিয়াছি এবং আপনি যে মজঃফরপুরের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন ইহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার কোথায় যাইবার অভিলাষ বলুন, আমি যথাসাধ্য তাহার

বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। যে পর্যন্ত আপনি নিরাপদ স্থানে না পৌঁছিতে পারিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার আতিথ্যগ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। তবে আমার বাসায় আপনাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে। কারণ মজঃফরপুরের ব্যাপার ইতিমধ্যেই সমস্তিপুরে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে।

মস্তকোপরি মৃত্যুর উদ্যত ভীমদণ্ড যিনি মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কালের করালহস্ত অকরুণভাবে যাঁহার দিকে প্রসারিত হইতেছিল সেই প্রফুল্ল তাঁহার এই অপরিচিত ভদ্রসন্তানের অযাচিত করুণাকে ঈশ্বরের দয়া জানিয়া সেই সর্বনিয়ন্তা ভয়ত্রাতা ভগবানের উদ্দেশ্যে বার বার নমস্কার করিতে লাগিলেন।

যিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন তাঁহার নাম ত্রিগুণাচরণ ঘোষ। তিনি বি, এন, ডবলিউ রেলওয়ের চাকুরি ব্যপদেশে সমস্তিপুরে থাকিতেন এবং মজঃফরপুরের জনসাধারণের নিকটও সুপরিচিত ছিলেন।

সেদিন আপনার চাকুরি, সম্পদ এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিয়া আপদ্‌গত প্রফুল্লর উদ্ধারকল্পে তাঁহাকে স্বেচ্ছায় আশ্রয় দিয়াছিলেন—ইহা তাঁহার সৎসাহস ও স্বজাতিপ্রীতির অবিস্মরণীয় অমর অবদান।

ত্রিগুণা বাবু প্রফুল্লকে তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বাজার হইতে নূতন পাঞ্জাবী, ধুতি, জুতা কিনিয়া

দিলেন। তাহারপর রাত্রের ট্রেনে মোকামার টিকেট কিনিয়া নিজে গিয়া ইণ্টারক্লাসে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

প্রফুল্ল ট্রেনের যে কামরায় উঠিলেন সেই কামরায় আরও দুইজন মজঃফরপুরের প্রবাসী বাঙালী ছিলেন। এক ব্যক্তির নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অপর জন মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। মৃত্যুঞ্জয় বাবুর যক্ষ্মা হইয়াছিল, ডাক্তার দেখাইতে কলিকাতা যাইতেছিলেন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি মজঃফরপুরের তৎকালীন সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লিডার শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। সে মানভূমে তার নিজ কার্যস্থলে যাইতেছিল। ৩০শে এপ্রিল (১৯০৮) তারিখে বোমা নিক্ষেপের ঘটনার রাত্রিতে সে মজঃফরপুর ছিল এবং ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানিয়া আসিয়াছিল। গাড়ীতে মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে আলোচনা চলিতে থাকে। প্রফুল্ল তাহাতে যোগ দেন এবং বিস্তারিত বিবরণ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রফুল্লর ফোলা পা তাহার আচরণ ও কথাবার্তায় দারোগা নন্দলালের সন্দেহ হয়। স্বার্থদাস তখন প্রফুল্লকে খুব ভালবাসা দেখাইল, তাহার পাশে আসিয়া বসিল, কত মিষ্ট কথা বলিল, তাহার মঙ্গলের জন্য কতই ব্যাকুলতা কতই আগ্রহ প্রকাশ করিল। তখন সে প্রফুল্লর বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দে ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়িল। নন্দলাল কেবল প্রফুল্লর প্রশংসা করিল এমন নহে,

প্রফুল্ল যাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন তাঁহাদের প্রতিও তাহার ভক্তি-ভালবাসা জানাইতে লাগিল।

প্রফুল্ল এমনই সরল ছিলেন, শৈশবকাল হইতে পল্লীগ্রামে মানুষ হইয়া সংসারের ধূর্ত্ততা এমনি কম বুঝিতেন, যে স্বার্থদাসের এই সকল কথার সরল ভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিলেন না।

মৃতুঞ্জয় বাবু তাঁহার পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন; তিনি এই সর্বনেশে ব্যাপার দেখিয়া প্রফুল্লকে সাবধান হইতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ইহার পর নন্দলালের প্রয়োজন চুকিয়া গেলে নিজের কাজ গোছাইয়া লইয়া সে সমস্তিপুর হইতে তাহার মাতামহ মজঃফরপুরের সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লিডার শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল যে একজন লোকের উপর তাহার সন্দেহ হইয়াছে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ তিনি যেন পুলিশ সাহেবের নিকট হইতে লইয়া পাঠান।

ইহার পর নন্দলালের কথাবার্তা প্রফুল্লর দুর্ভাবনার মধ্যে সংযুক্তির মত মনে হয় নাই। পথিমধ্যে তাঁহার নানা বিষয়ে চিন্তা উপস্থিত হইল। সমস্তিপুর ও সেমারিয়াঘাটের মধ্যবর্তী এক স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইলে তিনি স্পষ্ট ঘৃণার নীরব পদাঘাতে নন্দলালের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য একটি কামরায় যাইয়া উঠিলেন।

ট্রেন সেমারিয়াঘাটে পৌঁছিল। অতঃপর প্রফুল্ল ও তাঁহার সহযাত্রীরা ফেরি স্টিমারে গঙ্গা পার হইয়া প্রত্যূষে মোকামাঘাটে

পৌঁছিলেন। মোকামাঘাটে সকাল বেলা নন্দলাল প্রফুল্লকে তাহার জিনিষপত্র দেখিতে বলে। ইহারই পূর্বে সে প্রফুল্লর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিল।

ঐ দিবস (২রা মে) সকাল সাড়ে দশটার সময় নন্দলাল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে তাহার টেলিগ্রামের জবাব পায়। তৎপর নন্দলাল প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিবার সময় দুইজন সাক্ষীকে উপস্থিত রাখিবার জন্য সরাসরি স্টেশন মাস্টারের অফিসে যায়। মোকামাঘাটের গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ সাবইনসপেক্টার শর্মা ও কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে লইয়া সে প্রফুল্লর নিকট উপস্থিত হয়। প্রফুল্লকে তার পড়িয়া শুনাইয়া নন্দলাল তাঁহাকে বলিল "আমি তোমাকে সন্দেহ করি।"

প্রফুল্ল অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়ায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মুহূর্তমধ্যে বিভ্রান্ত-মস্তিষ্ক প্রফুল্লর হৃদয়ে নূতন বল আসিল। পর মুহূর্তেই পিস্তল বাহির করিয়া তিনি উর্ধে গুলি ছুড়িয়া দেশদ্রোহী নন্দলাল ও গ্রেপ্তারকারী কনস্টেবলকে সরাইয়া দিলেন। ইহার পর দুইটিমাত্র কথা বলিবার তিনি অবসর পাইয়াছিলেন। প্রফুল্ল চিৎকার করিয়া বলিলেন, "অ্যাঃ অ্যাঃ তুমি বাঙালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ? প্রফুল্ল বল প্রয়োগের কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করে না।"

প্রফুল্ল তখন দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পিস্তল নিজের দিকে ঘুরাইয়া ধরিলেন। তাহার পর তিনি নিজের উপর দুইবার

গুলি ছোড়েন। প্রথম গুলি বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশে (Dorsal region এ) পৌঁছে এবং দ্বিতীয় গুলি প্রফুল্লর ললাটাগ্র কুণ্ডলী (Prefrontal Convolution) ভেদ করিয়া যায়। প্রফুল্লর দেহ লুটাইয়া পড়িল। প্রফুল্ল বিনাশকে ধরিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিলেন। সম্ভূতিকে ধরিয়া অমৃত লাভ করিলেন। প্রফুল্ল অগ্নিযুগের প্রথম আত্মমেধীর মর্যাদা লাভ করিলেন।

প্রফুল্লর আত্মাহুতির কালে নিজহস্তে নিজের দেহের সাঙ্ঘাতিক অংশে বা মর্মস্থানের উপর পর পর দুইটি প্রাণ-সংহারক গুলি নিক্ষেপ আত্মমেধ তত্ত্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা।

বিদেশী সরকার দেশদ্রোহী নন্দলালকে পুরস্কৃত করে। নন্দলালের পদোন্নতি হয় এবং সরকার বাহাদুর তাহাকে দ্বারভাঙ্গা জেলায় ৫০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করে।

প্রফুল্লর সমকালবর্তী ও উত্তরকালের বিপ্লবিগণ নন্দলালের এই দেশদ্রোহিতার প্রতিশোধ লইতে ত্রুটি করেন নাই। তাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করিবার চেষ্টায় বিপ্লবিগণ সশস্ত্রে সুযোগ অন্বেষণ করিয়া চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে সুযোগও আসিল। ১৯০৮ সনের ৯ই নভেম্বর রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতায় কেরানীবাগান ও সার্পেন্টাইন লেনের সংযোগস্থলে এক যুবকের গুলিতে দারোগা নন্দলাল নিহত হয়। নন্দলাল যখন ডাকবাক্সে দুইখানা চিঠি ফেলিয়া তাহার ১০০।২ নং সার্পেন্টাইন লেনের বাসায় প্রত্যাবর্তন করিতেছিল

এমন সময় প্রিয়জনের কণ্ঠে কে যেন তাহাকে ডাকে "নন্দ দা নাকি ?" ডাক শুনিয়া সে অপেক্ষমান বন্ধুদের সহিত সাক্ষাতের জন্য দাঁড়ায়। এমন সময় তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। সে সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পতিত হয়। একটি কথাও সে বলিতে পারে নাই। লোকচক্ষুর অন্তরালে নন্দলালের প্রাণবায়ু নির্গত হয়। অতঃপর বিপ্লবীরা নির্ভাবনায় সেই সংবাদ তাহার বাসায় জানইয়া দিয়া অন্ধকারের মধ্যে উধাও হইয়া যায়।

২রা মে বিকাল প্রায় ৪টায় মজঃফরপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আরমস্ট্রং মোকামা গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের (G. R. Police) নিকট হইতে দুই খানা টেলিগ্রাম পাইয়া প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহের ফটো লইবার জন্য আদেশ দিয়া পাঠায়। সেই রাত্রিতে মৃতদেহ লইয়া দারোগা নন্দলাল মজঃফরপুর রওনা হয়। মহকুমা হাকিম মিঃ বার্ট এবং পাটনার পুলিশ সাহেব রক্ষকরূপে মৃতদেহের সঙ্গে যায়। মজঃফরপুরের পুলিশ সাহেবের আদেশে মজঃফরপুর হইতে দুই জন দারোগা তিন জন সাক্ষী লইয়া মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য বারুনী স্টেশনে যায়। সেখানে মৃতদেহ সনাক্ত করা হয় এবং মৃতদেহের ফটো লওয়া হয়। অতঃপর ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত করাইবার জন্য ও মৃতদেহের শবাস্তুক পরীক্ষার জন্য (Post-Mortem Examination) ৩রা মে প্রফুল্লর মৃতদেহ

মজঃফরপুরে আনা হয়। মজঃফরপুর স্টেশনে প্রফুল্লর মৃতদেহ দেখিবার জন্য শহরের অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রফুল্লর মৃতদেহ দেখিয়া উপস্থিত সকলের আননে এক অপূর্ব বেদনা বিধুরতার ছায়া ফুটিয়া উঠে।

অতঃপর ক্ষুদিরামকে মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য উপস্থিত করা হইল।

পরলোকগত বন্ধুর মুখে তাঁহার চরিত্রের তেজঃপূর্ণ পুণ্যজ্যোতি মৃত্যুদ্বারাও কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই দেখিয়া ক্ষুদিরাম অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। মৃতদেহের শিয়রে দাঁড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ আমার জীবনব্রত সাধন করিতে সমর্থ হই।" এই প্রথম জানা গেল যে তাঁহার সহিত প্রফুল্লর কতটা অন্তরের যোগ হইয়াছিল এবং ইঁহারও জীবনের ইতিহাস কেমন আশ্চর্য ইতিহাস ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উড্ম্যান ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুমি ইহাকে চেন?

ক্ষুদিরাম জবাব দিলেন—আজ্ঞে হাঁ, আমি ইহাকে চিনি; তবে ইঁহার চুল কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

ক্ষুদিরামকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল চুল কাটিয়া ফেলা হয় নাই, তাহার মুখে ও মাথায় বরফ জল দেওয়াতে চুলগুলি পিছন দিকে সরিয়া গিয়াছে।

ম্যাজিঃ—ইহা কার দেহ ?

ক্ষুদিরাম—ইহা দীনেশচন্দ্র রায়ের দেহ।

ম্যাজিঃ—(একটি রক্তাক্ত নূতন পাঞ্জাবী দেখাইয়া) ইহার কার জামা চিনিতে পার ?

ক্ষুদিরাম—আজ্ঞে না ইহা আমি চিনিতে পারিতেছিনা।

ম্যাজিঃ—(এক জোড়া পাম্পস্যু ও একটা ময়লা গেঞ্জী দেখাইয়া) ইহা চিনিতে পার ?

ক্ষুদিরাম—আজ্ঞে না আমি এই জুতা ও গেঞ্জী দেখি নাই।

ম্যাজিঃ—(একটি ব্রাউনিং পিস্তল দেখাইয়া) ইহা কখনও দেখিয়াছিলে ?

ক্ষুদিরাম—আজ্ঞে না এই পিস্তল আমি কখনও দেখি নাই। তবে দীনেশ বলিয়াছিল যে তাহার নিকট একটি পিস্তল আছে।

ম্যাজিঃ—(দুইখানি ছেঁড়া চাদর দেখাইয়া) এই চাদর কার বলিতে পার ?

ক্ষুদিরাম—এই চাদর দুইখানি দীনেশের। একখানা চাদর ছিঁড়িয়া দুইখানা করা হইয়াছে। আমি যখন দেখিয়াছিলাম তখন এই চাদর ছেঁড়া ছিল না।

ম্যাজিঃ—(একখানা ধুতি দেখাইয়া) ইহা কাহার ধুতি ?

ক্ষুদিরাম—আমি চিনিতে পারিতেছিনা।

ম্যাজিঃ—দীনেশ কোথায় থাকিত? কোথায় পড়িত তাহা কি জান?

ক্ষুদিরাম—দীনেশ তাহার ভাইয়ের সহিত বাঁকীপুরে থাকিত, সে নিজে আমায় এইকথা বলিয়াছিল। কোথায় পড়িত তাহা আমি জানিনা।

ম্যাজিঃ—তাহার ভাইয়ের নাম জান?

ক্ষুদিরাম—আমি তাহার ভাইয়ের নাম জানিনা।

ক্ষুদিরামের সনাক্তে সরকারের মন উঠিলনা। অতঃপর প্রফুল্লর গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন দেহের উপর দিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বজ্রপেষণ চলিল। প্রফুল্লর দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনরায় সনাক্ত করিবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। কেহই তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিত অন্ত্যেষ্টি সংকারের ব্যবস্থা করে নাই। অবশেষে তাঁহার অনুপস্থিত আত্মীয় পরিজনের অন্তরে চির শোক-শল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা প্রফুল্লর দেহের একাংশ শ্মশানে শৃগাল কুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। যাঁহার মৃতদেহ অশ্রুজলে সিঞ্চিত ও পুষ্পমাল্য-চন্দনে বিভূষিত করিয়া চন্দন-কাষ্ঠের চিতায় সমর্পণ করিয়া পরে সেই ভস্মীভূত দেহের পুণ্য বিভূতি সর্বাঙ্গে মাখিয়াও আত্মীয় বন্ধুর তৃপ্তি হইতনা নির্মম বিদেশী শাসকের হাতে পড়িয়া সেই দেব-দুর্লভ মৃতদেহের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ আর স্থির থাকিতে পারিল না। ২রা মে তারিখে তাহারা ৩২ নং মুরারীপুকুর রোড,

৩৮-৫ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন ও ৪৮ নং গ্রে স্ট্রিট হইতে ১৪ জন বিদ্রোহীকে বন্দুক, রিভলবার, বিস্ফোরক পদার্থ, বোমা ও বোমা প্রস্তুত বিষয়ক পুস্তকাদি সহ বন্দী করিয়া আনিল।

রজনী সরকার নামে এক গুপ্তচর কোন ছেলের বন্ধু পরিচয়ে মুরারীপুকুর বাগানের (মাণিকতলা) ভিতরে আসে এবং সব জানিয়া শুনিয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পর বাগানবাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল।

৪ঠা মে (১৯০৮) তারিখে এই ১৪ জন বন্দীকে ২৪ পরগণার অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি সাহেবের নিকট হাজির করা হইল এবং বারীন্দ্র প্রভৃতি পাঁচ জন স্বীকারোক্তি করিল। ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোসাঁই ধৃত হইয়া অনেক কথা প্রকাশ করিয়া দিল। এই সমস্ত স্বীকারোক্তির ফলে আরও অনেকে ধৃত হইল। পরে এইরূপ বিভিন্ন সময়ে বন্দীকৃত ৩৭ জন বিদ্রোহীর বিচার আলিপুরের এ্যাডিসনাল সেসনস্ জজ বীচক্রফ্‌ট্ সাহেবের নিকট ১৯শে অক্টোবর তারিখে আরম্ভ হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট পক্ষে নর্টন সাহেব প্রমুখ ব্যারিস্টার ও উকীলগণ এবং আসামীগণের পক্ষে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যারিস্টার ও উকীলগণ মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন।

পরে শ্রীঅরবিন্দের ইচ্ছামত চিত্তরঞ্জন এই মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯শে অক্টোবর (১৯০৮) হইতে সেসনস্

কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭ই নভেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য কোর্টে অবতীর্ণ হইলেন।

২৩শে মার্চ হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়া চিত্তরঞ্জন 'ছলজব' করেন। এই সওয়াল প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গভর্ণমেণ্টের মস্তিষ্কে যদি সত্যই এই ধারণার উদয় হইয়া থাকে যে গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি-মূল শিথিল করিবার জন্য এক বিশাল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয়ই সত্য যে এমন সব গুপ্তচর আছে যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

The evidence as is furnished by the confessions in this court—confessions upon which the prosecution relies—you will find that it is a childish conspiracy—a toy revolution. It is impossible that Aurobinda could even believe in his heart of hearts that by bombing one or two Englishmen or some Englishmen at different places they would even have been able to subvert the British Government. If you credit him with intellectual powers and say that he was a brilliant mind it is open to you at the same time to say that he was the leader of a childish conspiracy and a toy revolution.

....................Either drop the suggestion that it is because of the intellectual powers, because of the brilliant qualities with which he is credited that you want the court to believe that he was the leader of this conspiracy ; or the other theory that he was in fact the leader of the conspiracy and of this alleged revolutionary project.

If the Government has taken into his head to believe

that there is a vast conspiracy which is threatening the stability of the Government, it is common knowledge that you do come across spies who give false evidence.

I shall just read a passage from a book written by an eminent Judge :—

"The Govt. under these circumstances have spies who riggle into the case, eavesdrop into families, abstract correspondence and false letters".

Therefore the evidence given before you is evidence that you can expect in a case like this.

তাহার পর চিত্তরঞ্জন কখনও জজ সাহেব কখনও জুরিদিগকে লক্ষ্য করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেন।

অভিযুক্ত অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে ১৯০৯ সালে বিচারক মিঃ বীচক্রফটকে উদ্দেশ করিয়া চিত্তরঞ্জন দাশ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন :

আপনার কাছে আমার আবেদন এই যে এই বিরোধ থামিয়া যাইবার বহুদিন পরে—এই বিক্ষোভ আর আলোড়ন থামিয়া যাইবার বহুদিন পরে—তাঁহার মৃত্যুর বহুদিন পরে তাঁহাকে লোকে মনে রাখিবে—মনে রাখিবে স্বদেশপ্রেমের কবিরূপে, জাতীয়তার উদ্গাতারূপে, মানব প্রেমিকরূপে। তাঁহার মৃত্যুর বহু বহু দিন পরে তাঁহার বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইবে শুধু ভারতে নয়, দূর সমুদ্রপারে দূর দেশান্তরে। তাই বলি, তাঁহার মতো ব্যক্তি শুধু এই বিচার সভার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাই—তিনি দাঁড়াইয়াছেন আসিয়া ইতিহাসের বিচারসভার সম্মুখে।

My appeal to you, therefore, is that a man like this who is being charged, charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the bar in this court, but stands before the bar of the High Court of history and my appeal to you is this : That long after the controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and lover of humanity.

Long after he is dead and gone his words will be echoed and re-echoed not only in India, but across distant seas and lands. Therefore, I say that the man in his position is not only standing before the bar of this court, but before the bar of the High Court of history.

The time has come, for you, Sir, to consider your judgement, and for you gentlemen, to consider your verdict. I appeal to you, Sir, in the name of all the tradition of the English bench that forms the most glorious chapter of English history, I appeal to you in the name of all that is noble, of all the thousand principles of law which have commented from the English bench, and I appeal to you in the name of the distinguished Judges who have administered the law in such a manner as to compel not only obedience, but the respect of all those in the cases in which he has administered the law. I appeal to you in the name of the glorious chapter of English history and let it not be said that an English judge forgot to establish justice. To you, gentlemen, I appeal in the name of this very ideal that Aurobinda preached and in the name of all the traditions of our

country, and let it not be said that two of his own countrymen were overcome by passion and prejudice and yielded to the clamour of the moment.

এই ইতিহাস বিখ্যাত মাণিকতলার বোমার মামলার গবেষণাপূর্ণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ অভিভাষণ শেষ হইল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত আদালতগৃহ নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ, জনসমাগমবিরহিতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

৬ই মে তারিখে রায় বাহির হইল। বারীন্দ্র, উল্লাসকর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত; উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ সরকার, বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন, সুধীরকুমার সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাস, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দ্রভূষণ রায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত; পরেশচন্দ্র মৌলিক, শিশিরকুমার ঘোষ ও নিরাপদ রায় দশবৎসরের জন্য দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত; অশোকচন্দ্র নন্দী, বালকৃষ্ণ হরি কানে, সুশীলকুমার সেন সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত; কৃষ্ণজীবন সান্যাল এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত; ও ১৭ জন অভিযোগ মুক্ত। আর অরবিন্দ নির্দোষ।

চিত্তরঞ্জনের অমিত পরিশ্রমে হাইকোর্টে আসামীদিগের নিম্নলিখিতরূপ দণ্ডহ্রাস হইয়াছিল।

আসামীগণের নাম	সেসনের দণ্ড	হাইকোর্টের দণ্ড
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—	মৃত্যু—	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর
উল্লাসকর দত্ত—	মৃত্যু—	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

আসামীগণের নাম	সেসনের দণ্ড	হাইকোর্টের দণ্ড
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	যাবজ্জীবন দ্বীঃ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর
বিভূতিভূষণ সরকার--	ঐ	১০বৎঃ জন্য দ্বীপান্তর
বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ।—	ঐ—	
সুধীরকুমার সরকার—	ঐ—	৭ বৎঃ দ্বীপান্তর
ইন্দ্রনাথ নন্দী ।—	ঐ—	মুক্ত
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য—	ঐ—	৭ বৎঃ দ্বীপান্তর
শৈলেন্দ্রনাথ বসু ।—	ঐ—	
হেমচন্দ্র দাস—	ঐ—	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর
হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল—	ঐ—	১০ বৎঃ দ্বীপান্তর
পরেশচন্দ্র মৌলিক—	১০ বঃ দ্বীঃ	৭ বৎঃ দ্বীপান্তর
শিশিরকুমার ঘোষ—	ঐ	৫ বৎঃ দ্বীপান্তর
নিরাপদ রায়—	ঐ—	ঐ
অশোকচন্দ্র নন্দী *—	৭ বৎঃ দ্বীঃ	
বালকৃষ্ণ হরি কানে—	ঐ—	মুক্ত
সুশীলকুমার সেন ।—	ঐ—	মুক্ত
কৃষ্ণজীবন সান্যাল ।—	১বঃ সশ্রম কারাবাস	মুক্ত

। হাইকোর্টের জজ সার লরেন্স জেঙ্কিন্স ও কার্ণডফের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে মিঃ হ্যারিংটনের বিচারে ৩ জন মুক্ত ও ২ জনের পূর্ববৎ দণ্ডাজ্ঞা।

* আপীল শেষ হইবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত।

২রা মে (১৯০৮) তারিখে পুলিশ ৩২নং মুরারীপুকুর রোড খানাতল্লাসীর সময় অন্যান্য জিনিষপত্রের সহিত তাহারা একখানা মনি-অর্ডার প্রাপ্তির রসিদও হস্তগত করে। দীনেশচন্দ্র রায় ওরফে প্রফুল্ল মজঃফরপুর ধর্মশালায় থাকিবার সময় কলিকাতা হইতে তাহার নামে ২০৲ টাকা মনিঅর্ডার যোগে মাহাতো ওয়ার্ডস এস্টেটের হেড্ ক্লার্ক বাবু কিশোরীমোহন বন্দোপাধ্যায়ের ঠিকানায় পাঠান হয়। উহাতে কিশোরীবাবু বকলমে দস্তখত করিয়াছিলেন। ঐ রসিদখানা সেই মনিঅর্ডার প্রাপ্তির রসিদ। ইহাতে কলিকাতার পুলিশের সন্দেহ হয়। তাহার পর তাহাদের নির্দেশে মজঃফরপুরের পুলিশ কিশোরীবাবুর বাড়ী খানাতল্লাসী করে। সেখানে সাদা কাগজে দীনেশচন্দ্র রায়ের (প্রফুল্লর) স্বাক্ষরযুক্ত একখানা ২০৲ টাকা প্রাপ্তির রসিদ পায়। কিশোরীবাবুর সহিত বাংলার বিপ্লবীদের যোগসূত্র আছে ভাবিয়া পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। বিশ হাজার টাকার জামিনে তিনি হাজতবাস হইতে মুক্তি পান।

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী প্রফুল্লর সহিত একই গাড়ীতে কলিকাতা যাইতেছিলেন। এই অপরাধে তিনিও গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনার অনতিকাল পরে মৃত্যুঞ্জয় মারা যান। ক্ষুদিরামের মোকদ্দমার রায় বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই আদালতে কিশোরীবাবুর ডাক পড়ে এবং জজ সাহেব তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে প্রমাণাভাবে সরকারপক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিতেছেন।

পুলিশ তদন্তের পর ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যার চেষ্টা, হত্যার চেষ্টায় সহায়তা এবং বিস্ফোরক আইন অনুসারে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। ক্ষুদিরামের বিচার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বারটডের নিকট ২১ মে (১৯০৮) আরম্ভ হয়। সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করে বাঁকীপুরের ব্যারিস্টার মিঃ মানুক এবং বাঁকীপুরের সরকারী উকীল বিনোদ-বিহারী মজুমদার। মজঃফরপুরে মিঃ বারটডের এজলাসে ২৩শে মে পুনরায় ক্ষুদিরামের জবানবন্দী লওয়া হয়। প্রথম জবান-বন্দীর সময় তিনি নিজে যেসব দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন দ্বিতীয় জবানবন্দী দিবার সময় তাহার কিছু অদল বদল করেন; তবে সকল স্থলেই সত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেন—আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু; পিতার নাম স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ বসু। আমি জাতিতে কায়স্থ ও পেশায় ছাত্র। আমার বাড়ী মেদিনীপুরের অন্তর্গত মোঝায়।

ম্যাজিঃ—তুমি ১লা মে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উড্ম্যানের নিকট কি কোনও জবানবন্দী দিয়াছিলেন?

ক্ষুদিরাম—আজ্ঞে হাঁ।

অতঃপর সেই জবানবন্দীর বঙ্গানুবাদ শুনান হইল। পরে প্রফুল্লর মৃত্যুকালীন ফটো দেখান হইলে ক্ষুদিরাম তাহা সনাক্ত করিল।

ম্যাজিঃ—দীনেশের সম্পূর্ণ নাম কি?

ক্ষুদিরাম—দীনেশচন্দ্র রায়।

ম্যাজিঃ—(দুই জোড়া জুতা দেখাইয়া) ইহা কাহার জুতা চিন ?

ক্ষুদিরাম—হাঁ দুই জোড়া জুতাই চিনি ; একজোড়া আমার আর একজোড়া দীনেশের।

ম্যাজিঃ—কোথায় এবং কোন্ সময়ে তোমরা জুতা ত্যাগ কর ?

ক্ষুদিরাম—বোমা নিক্ষেপ করিবার দশপনেরো মিনিট পূর্বে একটি গাছতলায় উহা রাখিয়া দিয়াছিলাম।

ম্যাজিঃ—(একটি নকসা দেখাইয়া) যে স্থানে তোমরা জুতা রাখিয়াছিলে, সেই স্থানটি এই নক্সায় নির্দেশ করিতে পার ?

ক্ষুদিরাম—হাঁ পারি (নক্সায় স্থানটি দেখাইল)

ম্যাজিঃ—এই ব্যাগটি চিনিতে পার ?

ক্ষুদিরাম—হাঁ পারি।

ম্যাজিঃ—কোথায় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলে ?

ক্ষুদিরাম—ধর্মশালায়—পশ্চিম মুখে একখানি ঘরের মধ্যে।

ম্যাজিঃ—ব্যাগটি ঘরে রাখিয়া আসিবার সময় ঘরের দরজা কি বন্ধ করিয়াছিলে ?

ক্ষুদিরাম—হাঁ বন্ধ করিয়া আসিয়াছিলাম।

ম্যাজিঃ—ব্যাগটি আনিয়াছিলে কেন ?

ক্ষুদিরাম—বোমা আনিবার জন্য আনিয়াছিলাম।

ম্যাজিঃ—ব্যাগের মধ্যে তুলো কি জন্য ছিল ?

ক্ষুদিরাম—তুলোর মধ্যে বোমা ছিল।

ম্যাজিঃ—এই টিনের কৌটাটি কোথায় রাখিয়াছিলে ?

ক্ষুদিরাম—মাঠের মধ্যে।

ম্যাজিঃ—এই টিনের কৌটা দিয়া কি করিতে ?

ক্ষুদিরাম—ইহার মধ্যে বোমা রাখা হইত।

ম্যাজিঃ—এই কাপড়টি চিনিতে পার ?

ক্ষুদিরাম—হাঁ, ইহাতে বোমা জড়ান ছিল।

ম্যাজিঃ—এই রিভলবার দুইটি চিনিতে পার ?

ক্ষুদিরাম—আজ্ঞে হাঁ।

ম্যাজিঃ—এই দুইটি রিভলবার, কার্টিজ, ঘড়ি, মনিব্যাগ, মোমবাতি, ফতুয়া, ও কোটটি তোমায় গ্রেপ্তার করিবার সময় তোমার কাছে ছিল ?

ক্ষুদিরাম—আজ্ঞে হাঁ।

ম্যাজিঃ—এই পিস্তলটি চিন ?

ক্ষুদিরাম—রেলওয়ে স্টেশনে জবানবন্দী দিবার সময় ইহা প্রথম দেখি। শুনিয়াছিলাম দীনেশের সঙ্গে একটি পিস্তল ছিল।

ম্যাজিঃ—কনস্টেবল ফৈয়জ খাঁ এবং তহশীলদার খাঁর এজাহার শুনিয়াছ কি ? তাহারা বলিয়াছে ঘটনার পূর্বে তোমাকে ও দীনেশকে তাহারা ক্লাবের বাহিরে দেখিয়াছিল ইহা কি সত্য ?

ক্ষুদিরাম—হাঁ, তাহারা আমাদের দেখিয়াছিল।

ম্যাজিঃ—তাহাদের এজাহার কি ঠিক ?

ক্ষুদিরাম—না সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

ম্যাজি—তাহাদের এজাহারের কোন্ কোন্ অংশ মিথ্যা ?

ক্ষুদিরাম—তাহারা বলিয়াছে যে বোমা ফাটিবার সময় তাহারা জজকোর্ট রোডে ছিল না—তাহা মিথ্যা। প্রকৃত পক্ষে তাহারা ঐ রাস্তায় একটি সেতুর উপর বসিয়াছিল ; আমি নক্সার মধ্যে তাহা দাগ দিয়া দেখাইয়া দিয়াছি।

ম্যাজিঃ—তোমার গ্রেপ্তার সম্পর্কে শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং এর এজাহার শুনিয়াছ কি ? ইহা সত্য ?

ক্ষুদিরাম—সম্পূর্ণ সত্য নয়, কিছু কিছু মিথ্যা আছে।

ম্যাজিঃ—তুমি দীনেশকে কতদিন যাবৎ চিনিতে ?

ক্ষুদিরাম—এখানে আসিবার পাঁচসাত দিন পূর্বে, যুগান্তর আফিসে তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

ম্যাজিঃ—তুমি যুগান্তর আফিসে কেন গিয়াছিলে ?

ক্ষুদিরাম—মেদিনীপুরে আমি যুগান্তর বিক্রয় করিতাম, কিছু দিন যাবৎ যুগান্তর কাগজ পাই নাই, তাই আফিসে খবর লইতে গিয়াছিলাম।

ম্যাজিঃ—দীনেশের সহিত তোমার কি কথা হয় ?

ক্ষুদিরাম—যুগান্তর আফিসে যাইবার দুইতিন দিন পরে একদিন আহার করিতে বসিয়াছি, তখন দীনেশ আসে। সে আসিয়া অপরিচিত বলিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করে যে কোথা

হইতে আসিয়াছ ? মেদিনীপুরে আমার বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা হইয়াছিল; আমার নাম বলিবার পর সে আমায় চিনিতে পারিল। অন্যান্য কথাবার্তার পর সে আমায় একটি কাজ করিতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কার পাইব বলিয়া উৎসাহিত করে। আমি তাহার কথায় স্বীকৃত হই এবং দীনেশ আমাকে শুক্রবার বেলা তিনটার সময় হাওড়া স্টেশনে দেখা করিতে বলে। তাহার কথামত হাওড়া স্টেশনে শুক্রবার দিন দেখা করিলে সে আমাকে দিয়া কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

ম্যাজিঃ—তুমি তাহাতে স্বীকৃত হইলে ?

ক্ষুদিরাম—হাঁ, আমায় নানাভাবে প্রলুব্ধ করিবার পর আমি তাহার কথায় স্বীকৃত হই।

ম্যাজিঃ—দীনেশ তোমায় কি কি বলিতে নিষেধ করিয়া দেয় ?

ক্ষুদিরাম—রিভলবার কোথায় পাইয়াছি, তাহা বলিতে নিষেধ করিয়াছিল। দীনেশ আমায় একটি রিভলবার দেয় এবং অমূল্যরতন দাশের নিকট রিভলবার পাইয়াছি, এইরূপ বলিতে শিখাইয়া দেয়, অতঃপর কলিকাতায় আমার কোনও বন্ধুবান্ধব আছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করে। আমি তাহার কথার উত্তরে "না" বলি। পুনরায় দীনেশ আমার কোন দুর-সম্পর্কীয় আত্মীয় কলিকাতায় আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করে। তদুত্তরে আমার এক মাতুল আছে বলিলে, সে, যদি কেহ

আমাকে জিজ্ঞাসা করে তবে তাহার নাম বলিতে শিখাইয়া দেয়।

ম্যাজিঃ—সে তোমায় আর কিছু বলিয়াছিল?

ক্ষুদিরাম—সে যে আমায় উৎসাহিত করিয়াছিল তাহা বলিতে নিষেধ করে। আমি যুগান্তর পড়িয়া ও বড় বড় নেতার বক্তৃতা শুনিয়া এই পথ ধরিয়াছি এইরূপ বলিতে শিখাইয়া দেয়।

ম্যাজিঃ—ধর্মশালায় তোমরা কতদিন ছিলে?

ক্ষুদিরাম—যেদিন মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে যাই সেদিন লইয়া পাঁচদিন ধর্মশালায় ছিলাম।

ম্যাজিঃ—দীনেশ তোমার সঙ্গে ছিল?

ক্ষুদিরাম—আজ্ঞে হাঁ।

ম্যাজিঃ—কিশোরীবাবুর সহিত কোনও কথাবার্তা হইয়াছিল?

ক্ষুদিরাম—না, কিশোরীবাবুর নাম আমি দীনেশের নিকট শুনিয়াছিলাম। তাঁহাকে কখনও দেখি নাই কিংবা তাঁহার সহিত আমার কোনও কথাবার্তা হয় নাই।

ম্যাজিঃ—তুমি স্বেচ্ছানুসারে এই জবানবন্দী দিয়াছ?

ক্ষুদিরাম—আজ্ঞে হাঁ, আমি স্বেচ্ছানুসারে এই জবানবন্দী দিয়াছি এবং ইহাই আমার নির্ভুল জবানবন্দী।

মামলায় মোট ২৪জন সাক্ষী সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। অতঃপর মিঃ বারটড্ ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করিয়া তাহাকে বিচারার্থ সেসন সোপর্দ করিলেন। পরে

ক্ষুদিরামের বিচার মজঃফরপুরের এ্যাডিসনাল সেসনস্ জজ মিঃ কারনডফের নিকট ৯ই জুন (১৯০৮) তারিখে আরম্ভ হয়। দুইজন এসেসরের সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালিত হইয়াছিল। এসেসর দুইজনের নাম বাবু নাথুনি প্রসাদ ও বাবু জনক প্রসাদ।

ক্ষুদিরামের পক্ষে মজঃফরপুরের উকীল কালিদাস বসু রংপুরের উকীল সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও নৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রমুখ উকীলগণ মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন।

ইহার জন্য কালিদাসবাবু যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা অতিমানুষিক বলিয়া অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। দিনের পর দিন কোর্টে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেন তারপর প্রতিরাত্রি জাগিয়া এই মোকদ্দমার জন্য প্রস্তুত হইতেন। রাত্রি দুইটার পূর্বে কোনও দিনই তাঁহার বিশ্রাম লাভের অবসর হইত না—এক একদিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত —বিশ্রামলাভ আদৌ হইত না।

১০ই জুন দ্বিতীয় দিবসের শুনানীকালে রংপুরের উকীল সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া ক্ষুদিরামের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। ক্ষুদিরাম তাঁহাকে তাঁহার আত্মপরিচয় দিবার পর বলেন যে আমাকে কোনও খবরের কাগজ বা বই পড়িতে দেয় না—পাইলে বড় ভাল হয়।

তখন ক্ষুদিরাম লেখাপড়ার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যারা তৃপ্তি জানে না, যারা মানুষের

কাছে মাত্র অবহেলাই পাইয়া আসিয়াছে তাহাদের কাছে পুস্তকপাঠ চিরানন্দ দায়ক, চিরস্থায়ী শান্তির আশ্রয়। অন্তর তাঁহার মনুষ্যজাতির প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ, সকলের সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিতে অবিচলিত নিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত। কিন্তু কারাগারে তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই কিছুই। কাজেই তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাপা দিয়া ক্ষুদিরাম নির্জন জীবন যাপনেই মনোযোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। জানা যায় কারাগারের নির্জন কক্ষে দিনরাত বদ্ধ হইয়া থাকিবার সময় ক্ষুদিরামের মনে পর্যায়ক্রমে যে সকল চিন্তা উদিত হইয়াছিল তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইংরেজের গোলাম প্রহরী ও গোয়েন্দারদল সে সব নিশ্চয়ই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

ক্ষুদিরামের পক্ষসমর্থক অন্যতম উকীল নৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ক্ষুদিরামের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্ষুদিরাম নৃপেন্দ্রবাবুকে তাঁহার সহকর্মী প্রফুল্লর কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রফুল্ল কিছুদিন নৃপেন বাবুর রংপুরের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে মোকামাঘাটে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে তিনি রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। শুনিয়া ক্ষুদিরাম মাথা নোয়াইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন।

১৩ই জুন (১৯০৮) ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করিয়া কালিদাসবাবু 'ছলজব' করিলেন। কালিদাসবাবু এইরূপ প্রমাণ

করিতে চেষ্টা করিলেন যে দীনেশই বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল—ক্ষুদিরাম নহে।

১৩ই জুন তারিখে রায় বাহির হইল—ক্ষুদিরাম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিরা পৃথিবীতে আসেন উপযুক্ত সময়ের বহু পূর্বে, তাই কাহাকেও ভোগ করিতে হয় কারাদণ্ড, কাহাকেও দিতে হয় জীবন, আবার কেহ হয় সমাজে পরিত্যক্ত। ক্ষুদিরামের বেলাই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন!

জজের মুখে ফাঁসির হুকুম শুনিয়াও ক্ষুদিরাম মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

ক্ষুদিরামকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া জজ ভাবিলেন যে আসামীর প্রতি যে চরম দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। জজ সাহেব সেই ধারণায় ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ?"

ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল—বুঝিয়াছি।

জজ বলিলেন আপীল সাত দিনের মধ্যে করিতে হইবে।

ক্ষুদিরাম বলিলেন—এখানে সকলের সম্মুখে আমার কিছু বলিবার আছে।

জজসাহেব—এখন আর তাহার সময় নাই; আমি শুনিতে চাই না।

ক্ষুদিরাম—আমাকে যদি বলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে

বোমা কিরূপে তৈয়ার করা হইয়াছে, সে কথাটা বুঝাইয়া বলিতে পারি।

জজসাহেব আসামীকে জেলে লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন।*

এখানেই এই ব্যাপারের নিবৃত্তি হইল না। কলিকাতা হাইকোর্টে এই মোকদ্দমার আপীল হইল। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ব্রেট ও রাইভ্‌স-এর আদালতে ৮ই ও ৯ই জুলাই আপীলের শুনানী হয়। ক্ষুদিরামের পক্ষে 'ছলজব' করেন শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু এবং সরকার পক্ষে 'ছলজব' করেন ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্র্যান্সার মিঃ ওর (Mr. ORR)।

১৩ই জুলাই হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় সেসন আদালতের প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখিয়া রায় দিলেন।

ইহার পর ক্ষুদিরামকে দিয়া যে প্রাণভিক্ষার আবেদন করান হয় বড়লাট তাহা অগ্রাহ্য করেন।

১১ই আগস্ট ফাঁসির দিন ধার্য হইল। তখন ওয়ার্ডাররা পর্যন্ত ক্ষুদিরামের অন্তরঙ্গ হইতে চায় যদি তাহাকে একটু খুশী করিতে পারে। ফাঁসীকাষ্ঠে কাল রং দেওয়া হইল—দড়ির সহিত ক্ষুদিরামের ওজনের একটি বালির বস্তা বাঁধিয়া দড়িটি ঠিক মজবুত কিনা তাহার পরীক্ষা করা হইল। ১০ই আগস্ট ফাঁসীর পূর্বদিন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা

* ১৯০৮ সনের ১৮ই জুন (১৩১৫ সালের ৪ঠা আষাঢ়) তারিখের সঞ্জীবনী পত্রিকায়, প্রকাশিত ক্ষুদিরামের মামলার বিবরণ হইতে উদ্ধৃত।

করিয়াছিলেন কোন জিনিষপত্রের দরকার আছে কিনা। অর্থাৎ যাহা চাও সম্ভব হইলে দিব। ফাঁসীর আসামীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করা হয়।

উকীল কালিদাস বাবু, উকীল ও "বেঙ্গলী" কাগজের সংবাদদাতা উপেন্দ্রনাথ সেন, উকীল ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন বাঙালী আবেদন করেন যে ক্ষুদিরামের ফাঁসীর সময় তাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন এবং তাঁহার মৃতদেহ হিন্দুমতে সৎকার করিবেন। উড্ম্যান সাহেব আদেশ দিলেন, দুইজন মাত্র বাঙালী ফাঁসীর সময় উপস্থিত থাকিবে, আর শব বহন করিবার জন্য বারজন ও শবের অনুগমনের জন্য বারজন থাকিবে। ইহারা সরকারের নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে যাইবে।

৯ই আগস্ট প্রত্যূষে জানা গেল ক্ষুদিরামের ফাঁসী অবিলম্বে হইবার সম্ভাবনা। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার ফাঁসী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

সরকারী প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ছিলেন উড্ম্যান সাহেব, দুইজন ডাক্তার ও কারাবিভাগের কর্তৃপক্ষ। ফাঁসীর সময় ক্ষুদিরামের মস্তক কৃষ্ণবর্ণ আবরণে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। ক্ষুদিরাম ধীরে ধীরে ফাঁসী মঞ্চে আরোহণ করেন। ক্ষুদিরামকে প্রথমে সনাক্ত করা হয়। ক্ষুদিরাম ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করিয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের দিকে ফিরিয়া তাকান। ফাঁসী দিবার কাজটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শেষ হয়। ফাঁসীমঞ্চে

আরোহণের দেড় মিনিটের মধ্যেই ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

যেরূপ ধীরভাবে ক্ষুদিরাম সেসনের বিচারালয়ের রায় শ্রবণ করিয়াছিলেন সেইরূপ ধীরভাবেই এবং কোনওরূপ উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়াই তিনি ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করেন। কাহারও সাহায্য না লইয়াই তিনি মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন। ১১ই আগস্ট রাত্রি পাঁচটার সময় ক্ষুদিরামকে ফাঁসীর সময় জানাইয়া দেওয়া হয়। ফাঁসীর নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পূর্বে তিনি স্নান করিয়া লইয়াছিলেন এবং শেষবারের জন্য নৈশবায়ু সেবন করেন। জানা যায় তিনি ফাঁসীমঞ্চে রওনা হইবার অব্যবহিত পূর্বে প্রহরীকর্তৃক সংগৃহীত শ্রীশ্রীচতুর্ভুজ ঠাকুরের চরণামৃত পান করেন।

সংবাদ পাওয়া মাত্র সকাল হইতে না হইতেই ক্ষুদিরামের অন্তিমদর্শনাকুল আবালবৃদ্ধবনিতা কারাগারের বহির্দ্বারে সমবেত হইতে থাকে। চলচ্ছক্তিহীন অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কিশোর বালকবালিকা ও রাজপুরুষ পর্যন্ত সকলেই ক্ষুদিরামকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসে। সকলেরই চক্ষু বাষ্পাকুল, কণ্ঠস্বর আর্দ্র, হৃদয় ভারাক্রান্ত। সমগ্র জন-হৃদয়ের উদ্বেলিত শোকোচ্ছ্বাস, গভীর গম্ভীর এক পবিত্র স্তব্ধতায় সমাহিত!

বেলা ৭টার সময় মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্য দিয়া শ্মশানবন্ধুগণ ক্ষুদিরামের শবাধার বহন করিয়া ধীরপদে শ্মশান

অভিমুখে যাত্রা করিল। শেষ বিদায় দৃশ্যের চিত্তদ্রাবী শোকাবেগ জনগণের হৃদয় উদ্বেলিত ও চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া ফেলে।

দর্শনাকুল উপস্থিত জনতাকে শবানুগমনে ও শ্মশানে যাইতে বাধা দেওয়া হয়; এবং পুলিশ জেল হইতে শ্মশান পর্যন্ত সমগ্র রাস্তা পাহারা দেয়—তাহারা সারিবদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকে।

বুড়ীগণ্ডকের তীরে চিতাশয্যা রচনা করা হইয়াছিল। যথারীতি শাস্ত্রাচার সমাপনান্তে কাষ্ঠে সজ্জিত চিতায় স্থাপিত ক্ষুদিরামের মুখমণ্ডলে চন্দন লেপন করা হইল। বেলা ৯টায় শ্মশানবন্ধুগণ মুখাগ্নি করেন। তারপর চিতা জ্বলিয়া উঠে। দেহ ভস্মীভূত হইতে বেশী সময় লাগিলনা। তারপর সব শেষ হইল—চিতা নিভিয়া গেল।

সপ্তম অধ্যায়

স্মৃতি তর্পণ

প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর আত্মদানের পর "এবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" ইত্যাদি গান বাংলার ভিখারী বাউল বৈষ্ণবের দল লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া একতারা, বেহালা, খঞ্জনী বাজাইয়া শুনাইত। এই সব গান শুনিলে বাংলার আবালবৃদ্ধ-বনিতার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। যাঁহাদের সাধনায় আমাদের মহৎ ইতিহাস রচিত হইয়াছে এতদিন আমরা তাঁহাদের সমুচিত পূজা করিতে পারি নাই। আজ আমরা তাহাই করিতে যাইতেছি। আজ আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহাক্ষণে উপস্থিত হইয়াছি। বহুকাল পরে আজ বৈদেশিক শাসনের অবসান হইয়াছে, তাই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের স্বদেশবাসী ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট সর্বপ্রথম ক্ষুদিরামের মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করে। কলিকাতায় য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ক্ষুদিরামের মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট বিপ্লবিগণ দেশের সেবায় ক্ষুদিরামের অমূল্য দান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে শ্রীমতিলাল রায় বলেন যে ক্ষুদিরাম যখন আত্মবলিদান করিয়াছিলেন তখন আজিকার এই অনুষ্ঠান ছিল কল্পনাতীত। অঘটন ঘটন পটিয়সী মহামায়ার লীলা সত্যই বিচিত্র ও

বিস্ময়কর—সত্যই মানব মনের অগোচর। দেশ-সেবা-যজ্ঞে ক্ষুদিরাম নিজের জীবনকে হবি-রূপে নিঃশেষে আহুতি দিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম যেরূপ বীরের ন্যায় মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন—তিনি যে মহান আদর্শের উপাসক ছিলেন এবং যেরূপ নিষ্ঠার সহিত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, মাতৃভূমির দাসত্ব মোচনের জন্য তিনি যে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং ভারতের বালক বালিকার সম্মুখে যে মহদ্দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন আমাদের দেশের ইতিহাসে তাহা একটি রোমাঞ্চকর অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। বাংলা দেশে যখন প্রতিযোগিতা চলিয়াছে—'এলো মেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই'—তখন ক্ষুদিরামের আদর্শের পুনপ্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুবার্ষিকী সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ২রা মে। প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্রীযুত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ শহীদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন—১৯০২ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসরের অবিচ্ছিন্ন সাধনার ও সঙ্ঘর্ষের ইতিহাস বাংলার ও ভারতের শহীদদের ছিন্ন কণ্ঠ ও বিদীর্ণ বক্ষের তপ্ত রক্তধারার ইতিহাস। সেই পুণ্য যুগের প্রথম গোমুখী উৎসে দাঁড়াইয়া আছে, নিষ্কাম ত্যাগের অপূর্ব মহিমায় বাংলার তরুণ শহীদ প্রফুল্ল চাকী।

নিখিল বঙ্গ নির্যাতিত কর্মী সঙ্ঘের উদ্যোগে সভার আয়োজন হয়।

যেখানে প্রফুল্ল চাকী আত্মবলিদান করিয়াছিলেন, সেই মোকামাঘাট স্টেশনের নাম পরিবর্তন করিয়া শহীদ প্রফুল্লঘাট স্টেশন নামকরণ করিবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

তদানীন্তন গোয়েন্দা অফিসের কর্মকেন্দ্র ৫৭ বি, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটস্থ ডানলপের বাড়ীতে প্রফুল্ল চাকীর দেহাবশেষ ভূপ্রোথিত আছে। সেইখানে মার্বেল পাথরের ফলকে প্রফুল্ল চাকীর আত্মদানের খোদিত স্মারকলিপি স্থাপন করিবার প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়।

অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের নাম পরিবর্তন করিয়া প্রফুল্ল চাকী পথ রাখা হউক।

স্বদেশী যুগের "সাপ্তাহিক যুগান্তর" পত্রিকার কর্ম সচিব শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শহীদ প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুকালীন একখানি প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সজ্জিত ও ধূপধুনায় সুরভিত করিয়া সকলের দৃষ্টিপথে স্থাপন করা হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলার বহু নির্যাতিত কর্মী ও সঙ্ঘের পক্ষ হইতে প্রতিকৃতির উপর মাল্য অর্পণ করা হয়।

শ্রীযুত বারীন ঘোষ বলেন—প্রফুল্ল চাকী রংপুর ন্যাশন্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি সেখান হইতে আসিয়া বক্তার সহিত মুরারিপুকুর বোমার বাগানে বিপ্লবের কাজে যোগ দেন।

সেখানে প্রফুল্ল গীতা ও উপনিষদ পাঠ করিতেন। একবার নয়, বার বার দেশের শত্রু বিনাশের ব্রত লইয়া তিনি জীবন দিতে আগাইয়া যান। সে যুগের সহকর্মী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু লাট সাহেবকে হত্যার জন্য বোমাসহ প্রফুল্লকে দার্জিলিং রাখিয়া আসেন। এই প্রফুল্লই বরিশাল হইতে নৈহাটি অবধি বোমা ও রিভলবার হাতে পূর্ববঙ্গের প্রথম ছোটলাট স্যর ব্যামফিল্ড ফুলারকে অনুসরণ করেন। দুই দুইবার দৈবক্রমে এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বহু স্বদেশী মোকদ্দমার কুখ্যাত বিচারক কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার আদেশ লইয়া প্রফুল্ল ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষুদিরামসহ মজঃফরপুর যান। প্রফুল্ল চাকী একদিকে ছিলেন মৃত্যুভয়হীন বীর, অন্যদিকে ছিলেন নারীর অধিক কোমল-প্রাণ। তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী নিরামিষাহারী ও যোগসাধনার একনিষ্ঠ সাধক। নিজে আত্ম-বলি দিতে উদ্যত হইয়াও তিনি উর্ধ্বে গুলী ছুড়িয়া দেশদ্রোহী নন্দলাল ও গ্রেপ্তারকারী কনস্টেবলকে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মারেন নাই। নিজের মাথায় ও বুকে গুলী চালাইয়াছিলেন। কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে তাহার গাড়ীতে মিস ও মিসেস কেনেডিকে হত্যা করায় প্রফুল্ল দুঃখিত হইয়াছিলেন।

"১৯০৮ সালের ১লা মে একটি গাছের আড়াল হইতে ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। এই বোমার শব্দ ২০ মাইল দূর অবধি শুনা গিয়াছিল।

মজঃফরপুর কোর্টে কিংসফোর্ডকে বধ করিবার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দিনের বেলায় শহরে উপস্থিত হয়, কিন্তু কোর্টে বোমা নিক্ষেপ করিলে বহু লোকের প্রাণ যাইবে আশঙ্কায় ভরা আদালতে সেই ভীষণ বোমা ব্যবহার করে নাই। এই মৃত্যুপণ যুবকদের দেবোপম মহত্ত্ব ও অপূর্ব করুণার পরিচয় প্রতি পদক্ষেপে পাওয়া যায়।

"বোমা ফেলিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দুইজন দুইদিকে চলিয়া যায়। প্রফুল্ল মজঃফরপুর হইতে ৪ স্টেশন দূরবর্তী সমস্তিপুরে পৌঁছে। তারপর মোকামাঘাটের টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠে। সেই গাড়ীতে ছিল দারোগা নন্দলাল। প্রফুল্লকে দেখিয়া নন্দলালের সন্দেহ হয়। প্রফুল্লর সরলতা হইল তাহার কাল। ধূর্ত নন্দলাল প্রফুল্লর সহিত ঘনিষ্ঠতা করে, বলে সেও দেশের ব্যথায় ব্যথী। মোকামাঘাট পৌঁছিয়া নন্দলাল প্রফুল্লকে দেখাইয়া পুলিশকে হুকুম করে—"পাকড়ো।" "তুমি বাঙালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ" এই বলিয়া প্রফুল্ল দৌড়াইল। চারিদিক হইতে পুলিশ তাহাকে ঘিরিতেছে দেখিয়া প্রফুল্ল বুঝিল তাহাকে মরিতে হইবে। শূন্যে গুলী ছুড়িয়া পুলিশকে হটাইয়া দিয়া নিজের উপর সে ২বার গুলি ছোড়ে। দ্বিতীয় গুলী তাহার কণ্ঠাস্থি ভেদ করিয়া যায়। তাহার হাত কাঁপে নাই, সাহস টলে নাই।

"আমি বাংলার তরুণ শহীদের স্মৃতিতর্পণ মণ্ডপে দাঁড়াইয়া

বিপ্লবীদলকে আহ্বান করিয়া বলি—বিস্মৃত হও তুচ্ছ নেতৃত্বের মান অভিমান। আবার কর্মক্ষেত্রে আসিয়া দেশকে শিখাও নিষ্কাম আত্মভোলা দেশ-সেবা।”

বিপ্লবী যুগের শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, বক্তা প্রফুল্লকে লইয়া লাটসাহেবকে মারিবার জন্য বোমাসহ দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে শ্রীযুত বসু তরুণদিগকে আহ্বান করেন।

শ্রীযুত হেমন্তকুমার বসু, এম, এল, এ বলেন, আত্মদানের মধ্য দিয়া স্বাধীনতার আদর্শ প্রফুল্ল চাকী আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অন্যান্য বিপ্লবীরা সেই বনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছে। আজ বৃটিশ শাসন হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা না হইলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে বলা যায় না। দেশে হাজার হাজার ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর সৃষ্টি হইলে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা হইতে পারে।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতি রক্ষার জন্য এ যাবৎ কোন চেষ্টাই হয় নাই। এখন তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া বক্তা আনন্দ প্রকাশ করেন।

মিঃ আব্দুল মালেক, শ্রীযুত কালীপদ বাগচী, শ্রীযুত পরমেশ রায়চৌধুরী, শ্রীযুত অবিনাশ রায়, শ্রীযুত অরবিন্দ বসু,

শ্রীযুত সতীশ সরকার, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ দেসরকার, শ্রীযুত জ্যোতিষ রায় ও ডাঃ যশোদা ভট্টাচার্য্যও প্রফুল্ল চাকীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৯৪৭ সাল হইতেই প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের স্মৃতির উদ্দেশে ভারতবাসীর নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলির বাস্ত .রূপ প্রদান করার চেষ্টা হয়। সর্ববিধ সৎকর্মে অনুরাগী শ্রীযুত অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের উদ্যোগে শ্রীযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ, মজঃফরপুর নগর কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে সভাপতি করিয়া ক্ষুদিরাম স্মৃতি কমিটি গঠিত হয়। মজঃফরপুর শহরের যে স্থানে ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল ঠিক সেই স্থানে মহানুভব শহীদ ক্ষুদিরামের স্মৃতি-সৌধ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। স্থানীয় হাসপাতালে প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের নামে একটি শল্য ওয়ার্ড খোলারও প্রস্তাব করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার শ্রীযুত ঈশ্বরদাস জালান, শ্রীযুত মহেশ প্রসাদ সিংহ, এম, এল, এ; এম, সি, এ এবং শ্রীযুত উমাশঙ্কর প্রসাদ প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তজ্জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়াছিলেন।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষুদিরাম স্মৃতি কমিটি প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুকে স্মৃতি স্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু নেহেরুজি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। যাহা হউক ২রা এপ্রিল (১৯৪৯) পূর্ব

নির্ধারিত দিনে স্মৃতি কমিটির সভাপতি শ্রীযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ সাধারণের সমক্ষে সেই স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন।

শ্রীযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে বলেন যে পণ্ডিত নেহেরু এখানে আসিবার পর এবিষয়ে তাঁহার সহিত সরাসরি কোন আলাপ না হইলেও রাষ্ট্রসচিব শ্রীযুত সত্যনারায়ণ সিংএর সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে। শ্রীযুত সত্যনারায়ণ সিং দিল্লী হইতে জানাইয়াছেন যে পণ্ডিত নেহেরু ইহার বিরোধী। শ্রীযুত সত্যনারায়ণ সিং অন্য তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে পণ্ডিত নেহেরু কংগ্রেসের একজন বড় নেতা বলিয়া এই ধরণের অনুষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত থাকিলে লোকে হয়ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবে, এই কারণেই তিনি ভিত্তি স্থাপনে অস্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ আরও বলেন যে সাধারণ কংগ্রেস-কর্মী হিসাবে এ বিষয়ে আর বেশী খোঁচাখুঁচি করা তাঁহাদের পক্ষে উচিত হইবে না। তিনি বলেন যে বিহারের প্রধানমন্ত্রী বিহার-কেশরী শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহও ক্ষুদিরামকে তাঁহার রাজনৈতিক গুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহারা সৈনিক মাত্র এবং সৈনিক হিসাবে অধিনায়কের আদেশ, সে আদেশ ভুল হইলেও—পালন করিবেন। শ্রীযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ পণ্ডিত নেহেরুর অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠান তিনিই সম্পন্ন করিবেন বলিয়া প্রথমে স্থির হইয়াছিল।

শ্রীযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ বলেন যে, ক্ষুদিরাম ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক এবং মজঃফরপুর জেলে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করিয়া তিনি সমস্ত বিপ্লবীর প্রাপ্য পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৯০৮ সালে যখন স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করাও অপরাধ ছিল, তখন একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দেশবাসীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এই যুবক জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া মজঃফরপুরে চলিয়া আসেন। তিনি যে বোমা নিক্ষেপ করেন তাহাতে শুধু চাঞ্চল্যের সৃষ্টিই হয় নাই লক্ষ লক্ষ প্রাণে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। শ্রীযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ বলেন যে ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতি বিপ্লবিগণ কংগ্রেস কর্মীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন—যদিও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ক্ষুদিরাম বসুর ভাগিনেয় শ্রীযুত ললিতমোহন রায় ক্ষুদিরাম স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বলেন, "আমার মাতা শ্রীযুক্তা অপরূপা দেবী এখন চলচ্ছক্তিহীন। তিনিই ক্ষুদিরাম বসুকে লালন পালন করিয়াছিলেন।" এই সময় ললিত বাবু কাঁদিতে থাকেন এবং প্রায় পাঁচ মিনিট যাবৎ কিছুতেই হৃদয়াবেগ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সমবেত জনতার অনেকেই প্রকাশ্যত বিচলিত হইয়া পড়েন। সেই পুরাতন দিনগুলির কথা মনে পড়ায়, প্রায়শ অবিচলিত বস্তুতান্ত্রিক সাংবাদিকের

দলও অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই—তাঁহারা রুমালে চোখ মুছিতে থাকেন।

অতঃপর ললিত বাবু বলেন "আমার মাতা শ্রীযুক্তা অপরূপা দেবী যখন শুনিতে পান যে মজঃফরপুরবাসীরা ক্ষুদিরামের একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ২রা এপ্রিল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন কিন্তু পথের ক্লেশ তাঁহার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাকে লইয়া আসা হয় নাই। পণ্ডিত নেহেরু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে অসম্মত হইয়াছেন জানিয়া তিনি নিরাশ হন। তিনি আরও বলেন যে হবিবপুরে ক্ষুদিরামের জন্মস্থানে একটি ক্ষুদ্র সমাধি নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে। এই স্থানটি বর্তমানে কোর্ট অব ওয়াড স'এর অধীন। হবিবপুর ক্ষুদিরাম স্মৃতি সংঘ এই স্থানটি পাইবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। ক্ষুদিরামের অপর একজন ভাগিনেয় শ্রীযুত ভীম রায়ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ললিতবাবু বলেন যে ক্ষুদিরাম ও তিনি একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। অনেকে হয়ত জানেন না যে 'সোনার বংলা' শীর্ষক একটি ইস্তাহার বিলি করার জন্য ১৯০৬ সালে ক্ষুদিরামকে একবার গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বলেন যে একবার তাঁহার মাতা (ক্ষুদিরামের ভগ্নী)

বিবাহ করার জন্য ক্ষুদিরামের উপর চাপ দেন। ইহার উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেন যে ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়িত হইবার পর তিনি বিবাহ সম্পর্কে চিন্তা করিতে পারেন। তিনি বলেন যে ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণের পূর্বে ক্ষুদিরাম তাঁহার ভগ্নী ও বক্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে মেদিনীপুর হইতে যাইতে দেয় নাই। এজন্য তাঁহাদের এখনও দুঃখ রহিয়া গিয়াছে।

অনুষ্ঠানে বহু সহস্র দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

১১ই আগস্ট ১৯৪৯ বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে নীলমণি মিত্র স্ট্রীটে মেদিনীপুর সম্মিলনীর উদ্যোগে ক্ষুদিরাম দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতিরূপে শ্রীযুত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ক্ষুদিরাম প্রমুখ শহীদদের অমরস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলেন যে, একদা দেশের দারুণ সঙ্কটক্ষণে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ বীরসন্তানগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সেদিন এসব বীর বিপ্লবিগণ মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম সাধারণ স্কুলের ছেলে ছিলেন। কিন্তু নিষ্পেষিত জনগণের দুর্দশায় অধীর হইয়া শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সহায়হীন সম্বলহীন কতকগুলি বালক ও যুবক সেদিন যে কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন সে কাজের পশ্চাতে ছিল এক মহতী সাধনা। ভারতের মুক্তিই ছিল তাঁহাদের একমাত্র ব্রত।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ ভারত দ্বিখণ্ডিত। খণ্ডিত এই ভারতের মুক্তির জন্য তাঁহারা আত্মাহুতি দেন নাই। সমগ্র ভারতের মুক্তির স্বপ্নই তাঁহারা দেখিয়াছিলেন।

১২ই ডিসেম্বর (১৯৪৯) বিহারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মজঃফরপুর ক্লাবের অনতিদূরে বহু সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। যেস্থানে ১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সেইস্থানে মূর্তিটি স্থাপন করা হইয়াছে। বিহার সরকার দুই কাঠা জমি অতিঅল্প খাজনায় ক্ষুদিরাম-স্মৃতি-কমিটিকে দিয়াছেন। কমিটি ঠিক মজঃফরপুর ক্লাবের সম্মুখে উক্ত স্থানটি প্রাচীর দিয়া বেস্টন করাইয়া লইয়াছেন। মধ্যস্থলে আট ফুট উচ্চ একটি বেদী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তাহারই উপরে শহীদ ক্ষুদিরামের প্রায় তিন ফুট উচ্চ প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত সিংহ বলেন যে, যে আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসা লাভের যোগ্য। ক্ষুদিরামের আদর্শনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা হইতে তরুণেরা অনেক কিছু শিক্ষা করিতে পারিবে।

আবরণ উন্মোচন করিবার সময় স্তব্ধ জনতার আঁখিপল্লব অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

এই উৎসব উপলক্ষে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর পক্ষ সমর্থক অন্যতম ব্যবহারজীবী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বৃন্দাবন হইতে

মজঃফরপুর আদালতে বিচার প্রহসনের বিবরণ দিয়া একটি বাণী পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীযুত লাহিড়ী তাঁহার বাণীতে বলেন—

"সেদিনের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। পদে পদে পুলিশ আমাদের অনুসরণ করিতেছে। ডাক বাংলোতে আমাদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। স্থানীয় লোকেরা আমাদের এড়াইয়া চলে। এই অবস্থায় আমাদিগকে কাজ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই স্থানীয় উকিল শ্রীকালিদাস বসু আমাদিগকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিলেন। জজের অনুমতি লইয়া আমি ক্ষুদিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার সহকর্মী প্রফুল্লর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রফুল্ল কিছুদিন আমাদের রংপুরের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম যে মোকামাঘাটে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইলে তিনি রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন। শুনিয়া ক্ষুদিরাম মাথা নোয়াইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে আমি কেন সেখানে গিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম যে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করাই আমার উদ্দেশ্য। তিনি মাথা নাড়াইয়া বলিলেন ইহা নিরর্থক আমি ইহা চাইনা। আমি বলিলাম 'তুমি চাও আর না চাও আমার ইহা কর্তব্য।'

বিচার আরম্ভ হইল; বিচার দেখিতে উপস্থিত ইউরোপীয় অফিসারদের পত্নীরা আসামীর এত অল্প বয়স, কোঁকড়া কোঁকড়া

চুলে ঢাকা সুন্দর মুখ, ছিপছিপে গড়ন, সর্বোপরি তাঁহার নির্ভীকতা ও বিচার সম্বন্ধে একান্ত নির্লিপ্ততা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

একজন সশস্ত্র ইউরোপীয় তরুণ সার্জেণ্ট কাঠগড়ার বাহিরে ক্ষুদিরামের পাশে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। ক্ষুদিরাম কখন বা বসিতেছেন কখন বা পায়চারি করিতেছেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য মাত্র একজন। এই ব্যক্তি বিধ্বস্ত গাড়ীর কোচম্যান। তাহার পায়ে ব্যাণ্ডেজ। এই সাক্ষীকে আমরা জেরা করিতে লাগিলাম। কিন্তু জজ অবাঞ্ছিতভাবে তাহা নষ্ট করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের প্রশ্নের উত্তর জজ নিজে সাক্ষীর মুখে জোগাইয়া দিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল। মামলার ফল কি হইবে বুঝাই গেল।

কিংসফোর্ড জজের পাশে একটি চেয়ারে বসিয়া সাক্ষ্য দিলেন। বিচার সপ্তাহ খানেক চলিল। জজ ফাঁসির হুকুম দিলেন। ক্ষুদিরামের মুখে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল না। ধীরভাবে তিনি দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিলেন। তরুণ সার্জেণ্ট বিড়বিড় করিয়া বলিল "সিংহের বাচ্চা"—আমি তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলাম।

পরে আমি ক্ষুদিরামকে হাইকোর্টে আপীল করার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম।

এবার আমাদের দুর্দশার পালা সুরু হইল; আমার ছোটভাই সিংহলে মহাবোধি কলেজে অধ্যাপনা করিত তাহাকে আলীপুর বোমার মামলায় জড়াইয়া ৫ বৎসরের জন্য অন্তরীণ করা হইল। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র জেলা হইতে বহিষ্কৃত হইল। আমার দ্বিতীয় পুত্রকে হাতিয়া দ্বীপে ৯ বৎসরের জন্য আটক রাখা হইল। তৃতীয় পুত্র ২ বৎসরের জন্য অন্তরীন হইল। কতবার যে আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত এবং বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল আজ তাহা মনে নাই। প্রায় মাসে মাসে আমাদের বাড়ী তচনচ করিয়া তল্লাস হইতে লাগিল। এই নির্যাতন ২০ বৎসরেরও বেশী সময় চলিল। তারপর হইল পাকিস্তান। সেই জন্য ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আমি এখানে আসিয়াছি। ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ছেলেবেলায় আমি যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতাম তাহা সার্থক হইতে দেখিবার জন্যই বুঝি দয়াময় ঈশ্বর আমায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।”

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের কাল একাল নয়। সেই কারণেই সেকাল সম্বন্ধে একালের লোকের চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের কালে তাঁহাদের কি আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভবিষ্যতের জন্য তাঁহারা কি দিয়া গেলেন—তাহার একটা সুস্পষ্ট হিসাব এখন খাড়া করিয়া তোলা দরকার। তবেই আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের কাল আবার কোন্ নূতন পথে চলিবে এবং কোন্ ভবিষ্যৎকে সামনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা, ইংরেজ রাজশক্তি তখন এদেশে তাঁহাদের শক্তির সর্বোচ্চ চূড়ায়। সেই দিনে দেখা দিল বঙ্গভঙ্গ, আর সেই ভাঙা বাংলার ফাটলের পথে বাহির হইয়া আসিল "অগ্নিযুগের বাংলা"। শ্রীঅরবিন্দ সেই অগ্নিযুগের প্রতীক এবং তিনিই ছিলেন সেই যুগের ধারক ও বাহক।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম তরুণ বয়সে দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া, দেশমাতৃকার ললাট হইতে দাসত্বের কলঙ্ক কালিমা মুছিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প লইয়া বিপ্লবীদলে যোগদান করিয়াছিলেন। তখনকার যুগের ভারতীয়েরা আমলাতান্ত্রিক ইংরেজশাসনকে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারকার মতই চিরস্থায়ী নিসর্গের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন। বিদেশী শাসন ও শোষণের লাঞ্ছনা-নিপীড়নে সমগ্র দেশ তখন ভয়ে সন্ত্রস্ত, বেদনায় মুহ্যমান—প্রতিবাদের সাহস কাহারও নাই, প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা কোথাও নাই। এই শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে, দাসত্বের গ্লানির বিরুদ্ধে জীবন পণ করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইবার সাহস ও সঙ্কল্প ছিল সেদিন মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকটি বিপ্লবী যুবকের। বাকী দেশটা ছিল মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন, নিষ্ক্রিয়তায় অসাড়। তেমন অবস্থায় মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের দ্বারা পরাধীনতার অবসান ঘটানো সম্ভব ছিল না। তাই তখন স্বল্প সংখ্যক লোকের সর্বাধিক ত্যাগের ভিতর দিয়া, চরম আত্মবলিদানের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশবাসীর মনে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করাই ছিল বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য যাহাতে

পরবর্তীকালে একদিন জাগ্রত জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে গণবিপ্লব সফল হইয়া উঠিতে পারে, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন হইতে পারে। এই বিপ্লব-ধর্ম-বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য বলিদান প্রয়োজন হইয়াছিল। দুই তিনজনের রক্ত পাইলে তবে ইহা সারবান হইবে। তখন প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের ডাক আসিল। প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম আপনাদিগকে নিঃশেষে দান করিয়া দিতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সেদিন তাঁহাদের পরিবারের লোকের কাছে নিদারুণ শোকের দিন হইলেও, তাঁহাদের কাছে পরম আনন্দের দিন ছিল। সেই যে তাঁহারা ত্যাগের পথে যাত্রা করিলেন—আর ফিরিলেন না। কি অপূর্ব এই দুইটি মূর্তিমান উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গের অগ্নিশিখা—যাহার স্পর্শে বাংলায় ও ভারতে শত শত অগ্নিশিখা পরে জ্বলিয়া উঠিল!

শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের আলোয় এমন কত প্রদীপ তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কত সংশয় অন্ধকারের মধ্যে, কত পাপরুদ্ধ কারাগারের মধ্যে এই দীপগুলি গিয়া পৌঁছিয়াছিল—দেশ-বিদেশে, দিক্‌দিগন্তরে—আজ তাহার স্মৃতি কে মনে করিয়া রাখিবে! বিধাতা যাঁহার হাতে আপনার সৃষ্টির আগুন সঁপিয়া দেন, তিনিই হন স্মৃত; কিন্তু সেই আগুন হইতে যাহারা দীপ্তি পায়, তাহারা হয় বিস্মৃত—ইহাই কালের নিয়ম।

এইরূপে প্রায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে তিন চার বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন, নূতন সাহিত্যের আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি একে একে উঠিয়া

সমস্ত বাংলা দেশকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া, তাহাকে সচেতন ও সবল করিয়া তুলিল। প্রাণ-চঞ্চল বাংলার প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখার বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায় ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ আলোকিত হইয়া উঠিল।

সেই অগ্নিযুগের বাংলার বুক হইতে আরও একটি ভাবধারা উৎসারিত হইয়া আসিয়াছিল—'স্বদেশী ও জাতীয়তা।' এই উৎসই কালক্রমে ভারতীয় জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতায় ব্যাপক-তর ও প্রবলতর প্রবাহের মূর্তি পরিগ্রহ করে। সমগ্র দেশ অনুভব করিল যে তাহার মধ্যে একটা বড় যুগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেই যুগ-শক্তির বিচিত্র লীলা এই সকল আন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিমালয় সম্বন্ধে যেমন কবি লিখিয়াছেন যে, হিমালয় একদা—

"..........................দুর্দম অগ্নিতাপ বেগে,
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে!"

ঠিক সেই রকমের একটি "অগ্নিতাপ বেগ" এই সময়ে সমস্ত দেশটাকে ঊর্ধ্বে উৎসারিত করিতেছিল এবং সেই প্রচণ্ড উৎ-সারের চূড়ায় চূড়ায় বড় বড় লোক দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের গায়ে দেশের ভাববাষ্প জমিয়া নূতন নূতন ধারা হইয়া দেশের মধ্যেই তাহারা আবার নামিয়া পড়িতেছিল। প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম এই যুগ-শক্তির উদ্বোধনেরই আয়োজন করিয়াছিলেন।

তাই তাঁহারা আজ কলিযুগের দধীচি হইয়া চিরকাল অমর হইয়া রহিলেন।
